ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থম

কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—২৯শে মে ১৯৬০

প্রকাশক
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, কর্নওআলিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শিল্পনির্দেশক
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক ও মুদ্রক
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট

গ্রন্থাবরক
দি সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

দাম: ২.৭৫ ন. প.

মণ্টু

রণ্টু

ভুটু

বাপী-কে

কিশোর-কিশোরীদের মনোরঞ্জনের জন্য এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'গ্রন্থম্' ইতিপূর্বে সাজিয়েছে নানাধরণের বইএর মেলা। আজও তেমনি ক'রে প্রকাশ করেছে একটি নতুন ভংগীতে লেখা অপূর্ব জীবন-কাব্য। লেখক উদীয়মান হ'লেও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এবং একনিষ্ঠ। দেশের যা'রা ভবিষ্যৎ, আশা করি তা'দের ভাল লাগবে এ বই এবং তা'রা এ থেকে জানবেও অনেক কিছু। খ্যাতিমান, নবাগত সকল লেখকের কাছ থেকেই 'গ্রন্থম্' কামনা ক'রে অকুণ্ঠ সহযোগিতা— তা'দের এই অভিনব কিশোর গ্রন্থ-প্রকাশন প্রচেষ্টায়।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

উপন্যাস —

আলোয় আঁধারে

দুরন্ত রাত্রি

তুলাদণ্ড (যন্ত্রস্থ)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

কল্যাণীয় রণ্টু,

তোমার সেদিনকার প্রশ্নটা আমি ভুলিনি। বিদেশ যাবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলাম তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারিনি। এখানে এসে প্রথম তোমাকে চিঠি লিখতে ব'সেছি।

তুমি জানতে চেয়েছিলে—মানবজন্মের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের বোধহয় একটিমাত্র উত্তর আছে। আর সেই উত্তর দিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি কি ব'লেছেন জান, বলেছেন "তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" বড় অদ্ভুত কথা, না! এমন অদ্ভুত কথা যিনি বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে জানবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই উৎসুক। অনেক বই লেখা হ'য়েছে এই মহাপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে। সারা ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষে কেন, সারা পৃথিবীতে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে এঁর নামে। বড় হ'লে তুমি সে সব বই পড়বে, হয়তো দেশে দেশে ঘুরে সেইসব প্রতিষ্ঠান দেখবার সৌভাগ্যও তোমার হবে। কিন্তু কথা কি জান, এমন অত্যাশ্চর্য কথা যিনি ব'লেছেন, তাঁর জীবন কত গভীর, আরও কত আশ্চর্য! রত্ন পাওয়া যায় সমুদ্রের অতলে। তোমাকে গত পূজার ছুটিতে পুরাণের কাহিনী পড়ে শুনিয়েছি। তুমি জান, অমৃত উঠেছিল সমুদ্র মন্থনের ফলে। সুতরাং এমন কথামৃত, একটি নয় শত শত কথামৃত যাঁর মুখ দিয়ে মুক্তার মত ঝ'রে পড়েছে তাঁর জীবনও সমুদ্রের মত গভীর, রহস্যময় আর সম্পদের আকর। এত বিরাট জীবনকে জানতে গেলে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হয়। এখন থেকে তুমি যদি একটু একটু ক'রে প্রস্তুত হও তা হ'লে ভবিষ্যতে এই মহাপুরুষকে নিশ্চয়ই চিন্‌তে পারবে, পারবে তাঁর

কথামৃতের মর্মোদ্ধার করতে। তোমাকে আমি সাহায্য করবো, এইভাবে চিঠির মারফত তাঁর জীবনী ও বাণী জানিয়ে। কৈশোরের এই প্রস্তুতি আগামী জীবনে নিশ্চয়ই তোমার কাজে লাগবে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্থান আর কালের প্রভাব পড়ে। আবার স্থানের প্রভাবে আর কালের প্রয়োজনে মানুষের মাঝে জন্ম নেন মহামানব। ইতিহাস বলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নবজাগরণ বা নবজন্ম হ'য়েছে। এই নবজন্মের সূচনা হয় পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের, ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের সংঘাতে এবং মিলনে। ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে মনের পরিচয় সুরু হয় এই বাংলাদেশে। এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে শুধু বাইরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হয় না। মানুষের মনোরাজ্যে যখনই বিপ্লবের সূত্রপাত হয় তখনই দৃষ্টির বাইরে কাজ ক'রে চলে এক অদৃশ্য দৈব শক্তি। আমেরিকার একজন মনীষী ইমার্সন বলেছেন—"প্রত্যেক নিগূঢ় সত্য অথবা ভাব আত্মপ্রকাশের জন্য নিজের প্রয়োজনমত মানুষ গ'ড়ে নেয়।" উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে এই উক্তির সত্যতা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সেইসময় বাংলার আকাশে বাতাসে এক নিগূঢ় ভাবধারা আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। লোকচক্ষুর আড়ালে ঈশ্বর গড়ছিলেন সব প্রয়োজনমত মানুষ। কিন্তু কি সে প্রয়োজন? আর কি পরিচয় সেই ঈশ্বরাদিষ্ট পুণ্যচরিত মানুষদের?

তখন বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার পদক্ষেপের সময়। এই নূতনের সঙ্গে পরিচয় থেকেই আমার উপরোক্ত প্রয়োজনের উদ্ভব। ব্যাপারটা একটু পরিস্কার করে বলি।

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন।

ওইদিন ক'লকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রচার প্রথম সমর্থন করেন রাজা রামমোহন রায়, আমাদের অন্যতম ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষ। এইসময়কার কথা চমৎকার ক'রে লিখে গেছেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি লিখেছেন—রাজা রামমোহন রায় যেন "স্বদেশবাসী-দিগের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন।" কিন্তু মনে রেখো যে রামমোহন কখনও আমাদের নিজস্ব সম্পদ, প্রাচীন দর্শন-বিজ্ঞান উপেক্ষা করবার পরামর্শ দেননি। মনে রেখো যে, রামমোহন আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন জন্মদাতা।

এর আগেই ইউরোপের ফরাসী দেশে এক প্রবল রাষ্ট্রবিপ্লব হ'য়েছিল। রাজতন্ত্রের অসংখ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের এই প্রথম সোচ্চার প্রতিবাদ। এই বিপ্লবের মধ্যে ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র। আর ছিল লোকাচার, দেশাচার, ধর্মবিশ্বাস—যা কিছু যুক্তিতর্ক দিয়ে পাওয়া যায় না—তার প্রতি শিক্ষিত মানুষের বিমুখতা।

ইউরোপীয় চিন্তাধারার এই নতুন স্রোতকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে পর্তুগীজ সাহেব। সে ১৮২৮ সালের কথা। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'লেন ডিরোজিও। ডিরোজিও তিন বছর হিন্দু কলেজে ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি বাংলাদেশের বহু যুবককে তাঁর নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত করেন।

এই নূতন শিক্ষার ফল সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা আছে ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায়। শোনো তাঁর কথা "তদবধি ইহাদের (অর্থাৎ নূতনের উপাসকদের) দল হইতে কালিদাস (মহাকবি কালিদাস ; সংস্কৃতে লেখা তাঁর অন্যতম প্রধান কাব্যের নাম 'শকুন্তলা') সরিয়া পড়িলেন ; শেক্‌সপীয়র (ইংরাজ মহাকবি ; এঁর অন্যতম প্রধান

নাটকের নাম 'হ্যামলেট') সেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; মহাভারত রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া এজওয়ার্থের গল্প (ইংরাজীতে লেখা উপদেশাত্মক গল্প) সেই স্থানে আসিল ; বাইবেলের (খৃষ্টানদের ধর্মপুস্তক) সমক্ষে বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।......নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও ; তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিনজনই তাঁহাদিগের একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন—প্রাচীতে যাহা কিছু তাহা হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ।"

এই নূতন জ্ঞানের আলো এসে পড়েছিল আমাদের ধর্মচিন্তায়, ধর্মানুষ্ঠানে এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে, সেখানেও সুরু হ'য়েছিল বিপ্লব। এরই পিছু পিছু এলেন বিদেশ থেকে খৃষ্টধর্ম প্রচারকের দল। ১৮৩০ সালে ক'লকাতায় এলেন এই প্রচারকদের প্রধান—আলেকজাণ্ডার ডাফ্। এইখান থেকেই হিন্দুসমাজের দুর্দশার আরম্ভ। এর কিছু আগেই অবশ্য রাজা রামমোহন রায় ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য স্থাপন ক'রেছিলেন ব্রহ্মমন্দির। ১৮৩৮ খৃঃ এই সূত্র ধ'রেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে নিয়েছিলেন পাদ্রীর আক্রমণ থেকে, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব থেকে আমাদের ধর্মকে রক্ষা করার ভার। ধীরে ধীরে এর থেকেই 'ব্রাহ্ম-সমাজের' জন্ম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নামটা শুনেই বোধ হয় ভাবতে আরম্ভ করেছ, কে এই মহর্ষি ? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। আরও মজার কথা কি জান, একদিকে রামমোহন, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ—আর এই দুই মহাপুরুষের মাঝে আলোকস্তম্ভের মত সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ।

তিনজনেরই নামের প্রথমে রয়েছে 'র' অক্ষর। ভুলে যেয়োনা যে তোমারও নামের প্রথম অক্ষর 'র'।

হিন্দুধর্মের এই দুর্দিনে শুধু দেবেন্দ্রনাথই নন্ অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরাও খুঁজছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছিলেন যে হিন্দুধর্ম বা হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান হেয় বস্তু নয়। কিন্তু শুধু ব্যাখ্য, শুধু যুক্তির জাল বুনে কি ধর্মের মর্ম বোঝানো যায়? যায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় এমন একজনের যিনি নিজের জীবনে ধর্মের মূল কথা রূপায়িত করবেন, নিজের সাধনা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রকৃত সত্য-কে। ইউরোপের মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন যে "শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ভারতের বহু শতাব্দীর সাধনার ফল।" বাংলাদেশের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রয়োজন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মহা আবির্ভাবের। যুক্তি ও তর্কের জালে যখন দেশ দিশেহারা তখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন "যত মত তত পথ।" সকলেই যখন চাইছে সত্য-কে জানতে অথচ পারছে না, মানুষের দৃষ্টি যখন আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে নানা মতের ধোঁয়ায়, তখনই দৃপ্তস্বরে ঘোষণা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ "ঈশ্বর এক; তাঁর ভাব অনন্ত। মানুষেরা এই ভাবরূপের উপাসনা ক'রে থাকে; সুতরাং উপাসনার প্রণালীও অনন্ত, তাঁর রূপও অনন্ত। তাঁকে ভালোবেসে যে যা' বলে তিনি তাই; পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতি যে নামে যে ডাকে সেইরূপেই তিনি দেখা দেন।..."

আন্তরিক হ'লে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে; ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খৃষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হ'লে সবাই পাবে .....ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(২)

আগের চিঠিতে মহামানবের আবির্ভাবের পূর্বক্ষণে কালের প্রস্তুতির কথা তোমায় বলেছি। এইবার দেখতে হবে স্থানের প্রভাব কেমন ক'রে এক গ্রাম্য প্রায়-অশিক্ষিত বালককে সাধনার দুর্গম পথে পা বাড়াতে সাহায্য ক'রেছিল। আমাদের কথায় বলে 'স্থান মাহাত্ম্য'। এই 'স্থান মাহাত্ম্য', এই পরিবেশের প্রভাব সেদিন এক শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত ক'রেছিল জীবনের মূল রহস্য জানবার অদম্য বাসনা। চারা গাছ যেমন একদিন মহীরুহে পরিণত হয়, তেমনি শিশু মনে যা ছিল অঙ্কুর রূপে, তাই কৈশোরে পুষ্ট হ'য়ে যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এনেছিল ভক্তির জোয়ার।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। এই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আদিবাস ছিল হুগলী জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে দেরেপুর গ্রামে। ক্ষুদিরামের অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। কর্তব্যপরায়ণ ও কর্মকুশল ক্ষুদিরাম কিন্তু তাতে বিচলিত হননি। জমিজমা এবং অন্যান্য বিষয়সম্পত্তির আয়ে সংসার স্বচ্ছল-ভাবে চালানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল। এককথায় তাঁর সংসারে কোনো অভাব ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মায়ের নাম চন্দ্রমণি দেবী। মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মত তিনি সংসার সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর দরজা থেকে কোনো প্রার্থী কখনও বিফল হ'য়ে ফিরে যেত না। এমন স্নেহশীলা, করুণাময়ী মা না হ'লে কি মহামানবকে কোলে ধরবার সৌভাগ্য হয়!

এইখানে আর একটা কথা ব'লে রাখি। চাটুয্যে পরিবারের গৃহদেবতা ছিলেন ৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্র। এইজন্যেই পরিবারের

প্রত্যেকের নামের সঙ্গে কি 'রাম' কথাটি জুড়ে দেবার প্রথা ছিল? শ্রীরামকৃষ্ণের দাদার নাম ছিল রামকুমার, দিদির নাম কাত্যায়নী।

বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলছিল ক্ষুদিরামের সংসার। ১৮১৪ খৃঃ কিন্তু আকাশে কালো মেঘ দেখা গেল। গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় হঠাৎ বিরূপ হ'লেন, বিরূপ হ'লেন ক্ষুদিরাম তাঁর কথামত মিথ্যা সাক্ষী সাজতে রাজী হ'লেন না ব'লে। পরম সত্যাশ্রয়ী ছিলেন ক্ষুদিরাম, তাই জমিদারের ক্রোধের আগুনে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিলেন হাসিমুখে। জমিদারের কারসাজিতে ভিটামাটি বেহাত হ'ল চাটুয্যে পরিবারের। স্ত্রীপুত্র ও গৃহদেবতাকে নিয়ে মহা চিন্তায় পড়লেন ক্ষুদিরাম, কোথায় যান, কি করেন। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা কখনও বিফল হয় না। আপাতঃ দুর্ঘটনার মধ্যেই থাকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ইঙ্গিত। এই দারুণ দুঃসময়ে ক্ষুদিরামের কাছে এল 'কামারপুকুর' গ্রামের তৎকালীন জমিদার, বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর সাদর আহ্বান। দেরেপুরের প্রায় এক ক্রোশ দূরে হুগলী জেলায় এই কামারপুকুর গ্রাম, শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি।

চিরতরে দেরেপুর ছেড়ে কামারপুকুরে আশ্রয় নিলেন ক্ষুদিরাম। সুখলাল গোস্বামীর বাড়ীর এক অংশে শুরু হ'ল নূতন জীবনযাত্রা। উর্বর ধানের জমি 'লক্ষ্মীজলা' পাওয়া গেল বন্ধুর কাছ থেকে। লক্ষ্মীর কল্যান স্পর্শ আবার ধীরে ধীরে এসে পড়ল ক্ষুদিরামের সংসারে। রঘুবীরের নাম নিয়ে বীরের মত জীবনযুদ্ধে নামলেন সত্যাশ্রয়ী ক্ষুদিরাম।

বড় সুন্দর এই কামারপুকুর গ্রামের অবস্থান। বর্ধমান থেকে ৺পুরীধাম পর্যন্ত রাস্তা চ'লে গিয়েছিল এই কামারপুকুরের মধ্য দিয়ে। তীর্থকামীর দল, সাধু-সন্ত প্রায় প্রত্যহই এসে আশ্রয় নিত

গ্রামের বাজারে আর পরবর্তী জমিদার লাহাবাবুদের অতিথিশালায়। অবস্থাপন্ন জমিদারের বদান্যতায় গ্রামে পূজা-পার্বন যাত্রা-কীর্তন ইত্যাদির অভাব ছিল না। কামারপুকুরের অদূরে ছিল 'মান্দারণ' গ্রাম। এই 'গড়মান্দারণ' অমর হ'য়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে। সব মিলিয়ে দেরেপুরের তুলনায় অনেক সুন্দর ছিল এই 'কামারপুকুর' গ্রাম।

কিন্তু সুন্দর হ'লেও 'কামারপুকুর' গ্রাম আকর্ষণ করতে পারেনি ক্ষুদিরামের অন্তর। পিতৃপুরুষের ভিটার মায়া জড়িয়ে ছিল তাঁরা মনপ্রাণ জুড়ে। সেই ভিটা থেকে বিতাড়িত হওয়ার বেদনা গভীর ভাবে বেজেছিল তাঁর বুকে। এই বেদনা ধীরে ধীরে রূপ নিল বৈরাগ্য ও ভক্তির ধীর-স্থির বিকাশে। এই সময়ে একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে পেলেন 'রঘুবীরশিলা'। অন্তরের প্রবল প্রেরণা এমনি কিছু একটা অবলম্বনই যেন তিনি খুঁজছিলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে রঘুবীরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন ক'রে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন ইষ্টের পূজায়। ঈশ্বর বিচিত্র পথে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেন। রামানন্দ রায়ের অত্যাচারে ক্ষুদিরাম আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন বিষয়-বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যের পথে। আর তাই বোধ হয় এই পরম পথের পথিক ক্ষুদিরামের ঘরে সম্ভব হ'য়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

শুধু পূজায় তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না ক্ষুদিরাম। তীর্থ দর্শনের অদম্য বাসনা পেয়ে বসল তাঁকে। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে দূর তীর্থ ভ্রমণ ছিল এক মহা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া দুর্গম পথে পা বাড়াতে কেউই সাহস করতেন না। কিন্তু কোনও বাধাই মানলেন না ক্ষুদিরাম। সকলেই বলেছে পথ দুর্গম ; তা হোক, সেই ক্ষুরধার পথেই ভারত-পরিক্রমার পথিক হবেন তিনি। একের পর এক তীর্থের পুণ্য সঞ্চয় ক'রে নিয়ে আসবেন তাঁর

কামারপুকুরের কুটিরে। তিল তিল ক'রে তীর্থরেণু দিয়ে সেখানে রচনা করবেন পরমপুরুষের আসন।

সুদূর দাক্ষিণাত্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে তীর্থদর্শন সেরে এলেন ক্ষুদিরাম। দীর্ঘ এক বৎসর পথে পথে কেটেছিল তাঁর। এরপর আবার বেশ কিছুদিন গেল ঘরে ব'সে পূজা-অর্চনায়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পুত্রের মুখ দেখলেন তিনি। রামেশ্বর-দর্শনের স্মৃতি অক্ষয় করার জন্যই বোধ হয় নবজাতকের নাম রাখলেন রামেশ্বর।

কিন্তু তীর্থ যাঁকে টানছে, কেমন ক'রে তিনি বদ্ধ থাকবেন ঘরে। অলক্ষ্যে বিধাতা তৈরী ক'রে চলেছেন মহামানবের আবির্ভাবের উপযুক্ত পুণ্য-আধার। প্রৌঢ় ক্ষুদিরাম তাই আবার বার হ'লেন পথে, লক্ষ্য বারাণসীতে ৺বিশ্বেশ্বর ও ৺গয়াধামে ৺শ্রীশ্রীগদাধর দর্শন। বারাণসীতে তীর্থ সেরে ৺গয়াধামে প্রায় একমাস ধ'রে তর্পন ইত্যাদি সমাপ্ত করলেন। তারপর ৺শ্রীশ্রীগদাধরের আশীর্বাদ নিয়ে পরিতৃপ্ত পুণ্যাত্মা ক্ষুদিরাম ফিরে এলেন কামারপুকুরে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল বিধাতার উদ্দেশ্য, কালের প্রয়োজন, পূর্ণ হবার পুণ্যক্ষণ। ১৮৩৬ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার (১২৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন) চন্দ্রাদেবীর কোল আলো ক'রে এল ক্ষুদিরামের তৃতীয় পুত্রসন্তান। ৺শ্রীশ্রীগদাধরের কৃপা স্মরণ করেই বোধহয় নবজাতকের নাম রাখা হ'ল 'গদাধর'।

অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না,— গোপনে আসে। দুই চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার এ কথা বার জন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল— হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(৩)

আগের দুটো চিঠিতে স্থান আর কালের কিছু কিছু পরিচয় তোমায় জানিয়েছি। এইবার তোমার পাত্রের সঙ্গে পরিচয় হবে। এইখানে একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার। তুমি নিশ্চয়ই জান, পাথরের ওপর বীজ ছড়ালে ফসল হয় না। ফসল ফলাবার জন্য চাই উর্বরা মাটি আর উপযুক্ত সার। মানুষের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে। আধার উপযুক্ত হ'লে তবেই না গুণের বিকাশ সম্ভব হয়। ইংরাজীতে একটা কথা আছে যার অর্থ হচ্ছে —শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যৎ বয়স্ক মানুষের ছবি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে হ'লে তোমাকে খুব মন দিয়ে জানতে হবে বালক গদাধরের জীবন।

তিন বছরের বালক গদাধরকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, সুস্থ লাবণ্যময় দেহ, অপূর্ব অপার্থিব এক কমনীয়তা মুখে, দৃষ্টিতে স্বপ্নের ছায়া। পিতামাতা, পাড়াপ্রতিবেশী সকলের প্রিয় এই বালক। তার মোহিনীশক্তিতে সকলেই আকৃষ্ট হয়, সকলেই তারও প্রিয়। বালকের মধ্যে সবাইকে ভালোবাসবার এই প্রবণতাটা লক্ষ্য করবার। বালকমাত্রেরই হয়তো এই মধুর স্বভাবটুকু থাকে, কিন্তু সকলেই বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই গুণকে ধ'রে রাখতে পারে না। তুমি দেখতে পাবে বালক গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েও সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি তাঁর এই স্বভাবের।

অবশ্য এও জেনে রাখো যে মোটেই শান্ত-শিষ্ট স্বভাব ছিল না বালক গদাধরের। শুধু দুরন্তই নয়, ভয়ের শাসনে কাবু করা যেতো না এই বালককে। বালক গদাধর একবার গোঁ ধরলে

একমাত্র স্নেহের স্পর্শে, আদরের ডাকে তাকে বশ করা সম্ভব হ'ত। এই নির্ভয়তা একটা অদ্ভুত গুণ, এ না থাকলে কোনও বড় কাজেই কেউ বড় হ'য়ে হাত দিতে পারেনা, ঈশ্বরকে জানার সাধনায় তো নয়ই। আরও যে সব বিশেষত্ব ছিল এই বালকের সেগুলো হচ্ছে অলৌকিক মেধা আর অপূর্ব স্মরণশক্তি। যে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা কুড়িয়ে মোটা মোটা একাধিক বই লেখা হ'য়েছে, তাঁর এই মেধা ও স্মরণশক্তির সম্পদ থাকাই স্বাভাবিক।

দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুণের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল বালক গদাধরের মধ্যে। বাবার কাছ থেকে পিতৃপুরুষদের নাম এবং নানা দেবদেবীর স্তোত্র ও প্রণাম-মন্ত্র শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো হ'য়ে যেত বালকের কণ্ঠস্থ। বিস্ময়কর এই ধারণাশক্তি দেখে শুধু বাবা নয় আর সকলেই আশ্চর্য হ'তেন এবং মনে মনে অনেকেই হয়তো ভাবতেন যে কি প্রতিভাবান এই বালক।

কিন্তু তবু পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় যাবার পর সামান্যতম প্রতিভার বিকাশও দেখা গেল না গদাধরের মধ্যে। পড়াশোনায় মোটেই মন ব'সল না বালকের, পাটীগণিতের যোগ-বিয়োগ দেখলে গায়ে তার জ্বর আসতো। তা হ'লে, কি ভাল লাগতো গদাধরের ?

তোমাদের এখন পড়াশোনার চেয়ে দেখি বেশী ভাল লাগে রেডিও, ফুটবল ইত্যাদি। গদাধরের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। তবে তখন তো আর আজকের মত আমোদ প্রমোদের নানা ব্যবস্থা ছিল না। ছিল যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি। এবং এই সবের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষার প্রচুর অবকাশ ছিল।

এই যাত্রা অথবা কথকতার খবর গদাধর একবার পেলেই হ'ল। তন্ময় হ'য়ে সেইসব আসরে বসে প্রতিটি কথা শোনা আর স্মৃতিতে সযত্নে ধারণ করা প্রতিটি কাহিনী, প্রতিটি উপদেশ—এ পেলে আর

কিছুই চাইত না বালক। তবে কি পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল? মোটেই না—পাঠশালার বাইরে পড়বার জিনিষের কি অভাব আছে। রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণে লেখা ভক্তদের কাহিনী সব পড়া হ'য়ে গেল, একবার নয়, বারবার। স্মৃতিতে লেখা হ'য়ে গেল এইসব বইয়ের প্রতিটি কথা। এ ছাড়াও আর একটি গুণ ছিল গদাধরের—গানের সুমিষ্ট সুরেলা গলা। কোন গান শুনলেই হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তা গদাধরের মুখস্থ আর পরক্ষণেই সঠিক সুরে গেয়ে শুনিয়ে সকলকে চমৎকৃত করা।

মহাভারত, রামায়ণ আর পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, গানের সুরে তন্ময় হ'য়ে যাবার সুদুর্লভ শক্তি, এইসব সম্পদ নিয়ে বেড়ে উঠতে লাগল বালক গদাধর। এইমাত্র আমি গানের সুরে তন্ময় হবার শক্তিকে সুদুর্লভ ব'লেছি। আমি দেখেছি তুমিও এক-মনে রেডিওর সামনে ব'সে গান শোন, কখনও কখনও গুন্‌গুন্ ক'রে দু একটা গানের সুর ধরবার চেষ্টাও কর। গানের মত, সুরের মত এমন সুন্দর আর কিছুই নেই। তুমি নিশ্চয়ই গল্প শুনেছো যে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বাঁশী বাজাতেন। এও জানো যে কীর্তনের মধুর সুরে আত্মহারা হ'তেন শ্রীচৈতন্যদেব। এই উভয় ক্ষেত্রেই র'য়েছে সেই সুরে তন্ময় হ'য়ে যাবার লক্ষণ। আমার কি মনে হয় জান, সুরের পথ বেয়েই আমাদের প্রথম পরিচয় হয় সুন্দর সব অনুভূতির সঙ্গে।

বালক গদাধরের তিনটি প্রধান এবং বিশিষ্ট গুণের কথা আরও একটু স্পষ্ট ক'রে ব'লে এই চিঠি শেষ করবো। প্রথম গুণ হচ্ছে ভয়শূন্যতা। এই ভয়শূন্যতা ছিল ব'লেই ব'নে-বাদাড়ে একা একা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো ছিল বালকের দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ। এই ঘোরা থেকেই এসেছিল নির্জনে থাকার অভ্যাস। আর এইজন্যেই বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে আমরা শুনেছি "ধ্যান কোথায় করবে,

না, মনে, বনে, কোণে"—অর্থাৎ মনে মনে, বনের নির্জনতায় আর একান্ত যদি বনে না যেতে পারো তো নির্জন ঘরের একান্তে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে আকর্ষণী শক্তি। শুধু গ্রামের মেয়েরাই ভালবাসতো না গদাধরকে, বয়স্করা পর্যন্ত তার সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত হ'তেন। ভবিষ্যৎ জীবনে যাকে সহরের অসংখ্য শিক্ষিত লোককে টেনে আনতে হবে ভগবানের স্নেহচ্ছায়ায়, তার এই গুণ না থাকলে চলবে কেন বল!

তৃতীয় গুণ হচ্ছে তন্ময়তা। ছোটবেলা থেকেই বালক সুন্দর দৃশ্য দেখলে, পৌরাণিক কাহিনী পড়লে বা গান-কথকতা প্রভৃতি শুনলে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতো। এ কোনও মানসিক ব্যাধি নয়, এ হচ্ছে তন্ময়তার চরম প্রকাশ। প্রকৃতির এমন গঠন ছিল বালকের যে যখন যে বিষয়ে মন আকৃষ্ট হ'ত, তাতেই একেবারে লীন হ'য়ে যেত মন। এই তন্ময়তার চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত আছে গদাধরের বাল্যজীবনের ঘটনায়।

ছয়-সাত বছরের বালক গদাধর যাচ্ছিল ধান ক্ষেতের আল বেয়ে, কোঁচড়ে তার মুড়ি, সঙ্গে একদল সাথী। বর্ষাকাল তখন আসি আসি করছে, আকশের বুক বেয়ে ছড়িয়ে আছে নিবিড় কালো মেঘ। কালো মেঘ আরো কালো হচ্ছে, আকাশের রূপ যাকে বলে নীলনবঘন। এমন সময় কালো মেঘের কোল ঘেঁসে সাদা সাদা পাখা মেলে উড়ে গেল একসারি বক্। অসীম আকাশে মিলিয়ে গেল সাদা বকের দল। গদাধরের মনে হ'ল তার অন্তরও যেন অজানা শূন্যে ওই বকের দলের মত উড়তে চাইছে পাখা মেলে। বালকের সারা হৃদয় জুড়ে এক বেদনাকরুণ পুলকের স্পন্দন, সব বাঁধন ছিন্ন ক'রে ছুটে যাবার তীব্র ব্যাকুলতা! কল্পনা কর, কি মহান, কি সুন্দর দৃশ্য আর তার সামনে দাঁড়িয়ে এক বালক

যার দেহ-মন এক আবেগমধুর আবেশের শিহরণে দুলে দুলে উঠছে। তীব্র দুঃখ এবং তীব্র আনন্দ-দুই সহ্য করা কঠিন। বালক গদাধরও সেদিন জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে প'ড়েছিল মাটিতে।

ইউরোপীয় এক পণ্ডিতের মুখে আমি শুনেছিলাম একটা সুন্দর কথা। শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ তিনি বলেছিলেন —ঈশ্বরের বিশ্ববিদ্যালয় সাজানো আছে প্রকৃতির বুকে; সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাঠ নিতে পারে তার আর শেখবার বাকি কিছু থাকেনা। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাই বলেছেন তাঁর কবিতায়ঃ

বহু ব্যয় ক'রে, বহু দেশঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু!
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,
দ্বারের বাহিরে দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শীষের উপরে, একটি শিশিরবিন্দু।

এই শিশিরবিন্দুটি দেখবার চোখ যার আছে সেই পারে প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিতে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো, যে বালক গদাধরের সে শক্তি পূর্ণমাত্রায় ছিল। আর তা ছিল বলেই কামার-পুকুরের বালক গদাধরই হয়েছিল পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ।

ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পায়। তার পরই কান্না বন্ধ হ'য়ে যায়। কেবল আনন্দ। আনন্দে মার দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, আবার হাসে। তিনিই সব হ'য়েছেন। তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বালকের স্বভাব; হাসে, কাঁদে, নাচে গায়; সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বর্তমান। —শ্রীরামকৃষ্ণ

(৪)

আমাদের একটা কথায় আছে—সুখ আর দুঃখ মানুষের জীবনে চাকার মত ঘুরে ঘুরে আসে। আর মানুষের জীবনে এই দুঃখের চরম প্রতীক হচ্ছে মৃত্যু, প্রিয়জনের মৃত্যু। তুমি নিশ্চয়ই জান কপিলাবস্তুর রাজকুমার যে তিনটে মর্মঘাতী দৃশ্য দেখে গৃহ ত্যাগ ক'রেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই মৃত্যু। মানুষের এই চরম দুঃখ দূর করবার জন্যে রাজকুমার সাধনা ক'রে লাভ ক'রেছিলেন বুদ্ধত্ব, আমরা পেয়েছিলাম গৌতম বুদ্ধকে। গদাধরের জীবনেও অপেক্ষা করে ছিল এই মৃত্যুর আঘাত। ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বাল্যেই শোনা গেল মৃত্যুর পদধ্বনি।

ক্ষুদিরামের হঠাৎ মৃত্যু হ'ল ; গদাধরের বয়স তখন সাত বৎসর। দাদা রামকুমার সংসারের ভার নিলেন। গদাধর তখন নিতান্ত বালক তবু পিতৃবিয়োগের ব্যথা তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ মনে গভীর ভাবে বেজেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সব কেমন যেন শূন্য মনে হ'তে লাগল। সবচেয়ে তাকে পীড়িত করল মায়ের বুকফাটা কান্না। বালক হ'লে কি হবে, মায়ের দুঃখ দেখে নিজের থেকেই ঘুরতে লাগল মায়ের কাছেকাছে, গৃহকর্মে সাহায্য ক'রে সান্ত্বনা দিতে চাইল শোকার্তা মা-কে।

কিন্তু চেষ্টা করলেও প্রিয়বিয়োগের ব্যথা কি চেপে রাখা যায়। তাই হঠাৎ উদাস মন নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তো গদাধর, সোজা এসে উঠত লাহাবাবুদের অতিথিশালায়। আগেই ব'লেছি কামারপুকুরের বুক চিরে চ'লে গেছে ৺পুরীধামে যাবার রাস্তা। পরিব্রাজক সব সাধু-সন্তরা এসে বিশ্রাম নিতেন অতিথিশালায়।

সেখানে এসে ব'সত গদাধর, সাধুদের মুখে নানা তীর্থের কথা আর ধর্মকাহিনী শুনতে শুনতে জুড়িয়ে যেত তার বুকের জ্বালা।

অন্যদিকে আবার সাধুদের সঙ্গে এই মেলামেশার ফলেই তার মধ্যকার স্বাভাবিক বৈরাগ্য ও ধ্যানপরায়ণতা খুঁজতে লাগল একটা প্রকাশের পথ। এই সময় তার অন্তরে এই আলোড়ন নানা ভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। একদিন পাশের গ্রাম আনুরে ৺বিশালাক্ষীর পূজা দিতে যাচ্ছিলেন কামারপুকুরের গৃহলক্ষ্মীরা, সঙ্গে চ'লেছে বালক গদাধর। আপনমনে ভক্তিমূলক গান গাইতে গাইতে মাঠের আল বেয়ে চ'লেছে সে। মধুর সুরে ক্ষণিকের জন্য যেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সারা প্রকৃতি, কান পেতে শুনছে সেই অপূর্ব গান। সহসা স্থাণুর মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গায়ক গদাধর, দেহ কঠিন ও নিস্পন্দ, দু'চোখ বেয়ে তার গড়িয়ে পড়ছে জলধারা। সেদিন সঙ্গের গৃহলক্ষ্মীরা ভেবেছিল হঠাৎ সর্দিগমিতে বুঝি মূর্ছা গেছে বালক। মূর্ছা যায়নি গদাধর। সেদিন তার মধ্যে যা দেখা গিয়েছিল, তা হ'চ্ছে তন্ময়তার চরম প্রকাশ, ধ্যানের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

নয় বছর বয়সে উপনয়ন হ'ল গদাধরের। আবার একবার প্রমাণ পাওয়া গেল তার নির্ভিকতার, দৃঢ়চিত্ততার। শাস্ত্রমতে নবীন ব্রহ্মচারীর মায়ের হাতে ভিক্ষা নেওয়াই নিয়ম। গদাধর কিন্তু ধাই-মা ধনী কামারণীকে কথা দিয়েছিল যে প্রথম ভিক্ষা তার হাত থেকে নেবে। হয়তো বাল্যের এক চপল মুহূর্তের কথা। তা ছাড়া ধাই-মার প্রতি তার স্নেহছিল অপরিসীম। তাই সকলের অনুনয়, উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে, দেশাচার, লোকাচার অমান্য ক'রে ধাই-মা ধনী কামারণীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নিল নবীন ব্রহ্মচারী। ব্যাপারটা একগুঁয়েমি বা হটকারিতা মনে হ'তে পারে ;

কিন্তু ঠিক তা নয়। ধাই-মা'র অনুরোধে কথা দিয়েছিল সে, হয়তো কিছু না বুঝেই শুধু সরল স্নেহের বশে স্বীকার ক'রেছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তার সেই স্বীকৃতির ফলাফল বুঝলেও, সত্য থেকে সেদিন বিচ্যুত হয়নি নয় বছরের বালক। সেই বয়সে এটুকু বুঝতে ভুল হয়নি যে জীবনে ভালোবাসার দাবীই প্রথম, সত্যপালনই প্রধান কর্তব্য। এমন সত্যনিষ্ঠা না থাকলে কেউ কি বড় হ'তে পারে!

ব্রহ্মচারী গদাধর পেল পূজার অধিকার, তার সবচেয়ে মনের মত কাজ। পূজা করতে ব'সে দেবদেবীর ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে যায় পূজারী, তখন যেন কিছুরই আর জ্ঞান থাকে না, বাইরের জগৎ তার কাছে লুপ্ত হ'য়ে যায়। আমি দেখেছি খবরের কাগজে লেখা ফুটবল আর ক্রিকেট খেলার খবর তুমি খুব তন্ময় হ'য়ে পড়। অনেক সময় তোমার মা বারবার ডেকে তোমার সাড়া পাননা। মা রেগে যান, বলেন অবাধ্য ছেলে। আমি কিন্তু জানি তুমি ইচ্ছে ক'রে যে সাড়া দাও না তা নয়, মায়ের কথা তোমার কানেই যায় না, তোমার প্রিয় খেলোয়াড়দের নিয়ে এত তন্ময় হ'য়ে থাক তুমি। এই তন্ময়তাই সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল গদাধরের মধ্যে, আরও তীব্র আরও গভীর ভাবে। তোমার কাছে যেমন খেলোয়াড়রা, তার কাছে তেমনি, ঠিক তেমনি নয়, আরও অনেক বেশী প্রিয় ছিল দেবদেবীর উপাসনা।

খুব খারাপ চলছিল না গদাধরের দিন, ধর্মসঙ্গীত, যাত্রা, কথকতা, পুরাণপাঠ, পূজা আর মাঝে মাঝে মা-কে সংসারের কাজে সাহায্য করা। অধিকাংশ সময় মায়ের কাছে থাকতে থাকতে পাড়ার মেয়েদের আসরে তার অবাধ গতিবিধি। ক্রমশঃ কথক ঠাকুরের ভূমিকা জুটে গেল। অপরাহ্নের শান্ত পরিবেশে সমবেত

সকলকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ ক'রে শোনায় গদাধর। গান আর অভিনয় দিয়ে বক্তব্য সুস্পষ্ট করে, কাহিনীতে করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এইভাবে পুরাতন ভারতের সঙ্গে পরিচয় গভীর থেকে গভীরতর হয়। ভাবীকালের পরমপুরুষের এদিকে পাঠশালায় যাওয়ার আর কোনও তাড়া ছিল না। ক্রমশঃ যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। তখন সবে তেরো বছর পার হ'য়েছে গদাধর।

আর ঠিক এই সময়েই আবার চাটুয্যে পরিবারে পড়ল মৃত্যুর কালো ছায়া। হঠাৎ মৃত্যু হ'ল দাদা রামকুমারের স্ত্রীর। কোথা থেকে কি হল কে জানে, তারপর থেকেই সংসারে দেখা দিল নানা বিশৃঙ্খলা, ঘনিয়ে এল অভাব-অনটন। বিপর্যস্ত রামকুমার আয়-বৃদ্ধির আশায় চ'লে গেলেন কলকাতা, সেখানে ঝামাপুকুরে খুললেন এক চতুষ্পাঠী। চতুষ্পাঠী কাকে বলে জান তো—সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কেন্দ্র, যাকে আমরা বলি টোল। এইসব ঘটনা ঘটল ১৮৫০ খৃঃ।

দাদা বিদেশে যেতে স্বাভাবিকভাবেই শাসন খানিকটা শিথিল হ'ল। গদাধরের জীবনের সুর-তাল-লয় কিন্তু তাতে বদলালো না। কিশোর গদাধরকে আমরা দেখছি, সেই আগেকার মতই ভাবুক আর ধ্যানপরায়ণ। তবে এইসময়ে তার চরিত্রের আর একটা দিক ধীরে ধীরে প্রকাশের পথে, প্রকাশ পাচ্ছে তার ক্রীড়া-কৌতুকে অনুরাগ আর রঙ্গরসপ্রিয়তা। তার তখনকার কথাবার্তা ছিল সহজ, সরল অনাবিল কৌতুকরসে ভরা। অপরের কণ্ঠস্বর, ভাবভঙ্গী নকল করাতেও কিশোর গদাধর ছিল অদ্বিতীয়। গদাধরের অভিনয়পটুতা ও সঙ্গীত প্রিয়তার কথা তোমায় আগেই ব'লেছি। মানুষের শিল্পী ও কবিমনের কিছু কিছু পরিচয় বাল্যকাল থেকেই পাওয়া যায়। জন্মশিল্পী জন্মকবি এই গ্রাম্য বালক। কারু

কাছে গান শেখেনি সে, তবু তার গলায় মধুর সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়নি এমন একটি মানুষও ছিল না কামারপুকুর গ্রামে। শুধু কি তাই, মূর্তিগঠন আর চিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল এই কিশোরের। এ ব্যাপারেও কেউ ছিল না শিক্ষা দেবার। পটুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে সে দেখত তাদের হাতের কাজ আর স্বাভাবিক প্রতিভা ও মনোনিবেশের ফলে উদ্বুদ্ধ হ'ত তার অন্তরের স্বভাব-শিল্পী।

কিন্তু সংসার কঠিন পরীক্ষার স্থান, বাস্তব বড় কড়া পরীক্ষক। গান গেয়ে বা মাটির মূর্তি তৈরী ক'রে সংসারের সাশ্রয় করা যায় না। এমন কি গ্রামের যাত্রার দলে যোগ দিয়ে বড় বড় ভূমিকায় মনমাতানো অভিনয়ও বাস্তবের প্রয়োজনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। হ'লও তাই। দিনকয়েকের জন্যে বাড়ী এসে, রামকুমার লক্ষ্য করলেন কনিষ্ঠের কার্যকলাপ। তখনই স্থির করলেন ভাইকে ক'লকাতায় নিজের কাছে নিয়ে যাওয়া। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান, দাদার প্রস্তাবে হাসিমুখে রাজী হ'ল গদাধর। অলক্ষ্য বিধাতার মুখে আবার দেখা গেল হাসি। ১৮৫৩ সালে ক'লকাতায় পা দিল কামারপুকুরের কিশোর গদাধর।

একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখী দাঁড়ে ব'সে তবে রাম রাম বলে। বনে উড়ে গেলে আবার ক্যাঁ ক্যাঁ করবে।

টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ীর একটি লক্ষণ যে সব ঘরে আলো থাকে। গরিবেরা তেল খরচ করতে পারে না, তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না। এই দেহমন্দির অন্ধকার রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জেলে দিতে হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(৫)

আজ থেকে প্রায় একশো ছ' বছর আগে আমাদের বাড়ীর খুব কাছে এসে প'ড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য তখনও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ হননি। ঝামাপুকুরে তখন দাদা রামকুমারকে পূজার্চনায় সাহায্য করছিল কামারপুকুরের কিশোর গদাধর। যজমানের বাড়ী ছোট-খাট পূজা চমৎকার ভাবে সম্পন্ন হচ্ছিল তার হাতে। এমন কি অনেক যজমানবাড়ীর আপন লোক হ'য়ে উঠেছিল সে। পাড়ায় সঙ্গী-সাথী জুটতেও দেরী হয়নি। পূজা, খেলা, গান-বাজনা, এসব নিয়ে জমিয়ে তুলল গদাধর।

রামকুমার কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভাইকে ক'লকাতায় এনে লেখাপড়া শেখানো। একদিন তাই ভাইকে কাছে বসিয়ে, পরম স্নেহে লেখাপড়া আরম্ভ করার উপদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণের ঘরে মূর্খ হ'য়ে থাকা যে অভিশাপ, এ কথাও বলতে ভুললেন না। দাদার প্রতি শুধু অনুরক্তই ছিল না গদাধর, দাদার প্রতি তার ছিল অগাধ স্নেহ আর পরম শ্রদ্ধা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন দাদার উপদেশে কানই নিল না সে। এমন কি দাদার মুখের উপরই উত্তর দিল "চালকলাবাঁধা বিদ্যেয় দরকার নেই আমার। শিখতে হয় তো এমন বিদ্যে শিখবো যাতে ঈশ্বরলাভ হয়।"

কিন্তু কোথায় শেখা যায় সেই বিদ্যা? কে সেই পরমবিদ্যার শিক্ষাদাতা? রামকুমার জানতেন না এ প্রশ্নের উত্তর। কিশোর গদাধরও নিশ্চয়ই জানতো না। অন্তরের এক অব্যক্ত ব্যাকুলতাই রূপ পেয়েছিল তার বাক্যে। কিন্তু যিনি জানতেন, যিনি সবই

জানেন, সেই বিশ্ববিধাতা ইতিমধ্যে ক'লকাতার অদূরে প্রস্তুত করছিলেন গদাধরের শিক্ষার ক্ষেত্র, সাধনার পীঠ।

বিশ্ববিধাতার এই ইচ্ছা রূপায়িত হচ্ছিল যাঁকে কেন্দ্র ক'রে সেই মহীয়সী মহিলার নাম রাণী রাসমণি। অত্যন্ত দরিদ্র গৃহস্থ-পরিবারের কন্যা ছিলেন রাসমণি। কিন্তু তাঁর বিবাহ হয় ক'লকাতার জানবাজারের প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে। পৌঢ়ত্বে পদার্পণের পূর্বেই চারটি কন্যা নিয়ে বিধবা হন রাসমণি। বিশাল জমিদারী-পরিচালনার ভার পড়ল এই কুলবধূর উপর। এতে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি এই তেজস্বিনী মহিলা। জমিদারী-পরিচালনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। আর এই জমিদারী-পরিচালনায় রাণী রাসমণির প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর তৃতীয় জামাতা মথুরনাথ বিশ্বাস। রাণী রাসমণি আর মথুরনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটা বড় অংশ অধিকার ক'রে আছেন এই দু'জন।

অশেষ ভক্তিমতী ছিলেন এই রাণী রাসমণি, তিনি ছিলেন ৺মা-কালীর সেবিকা। তাঁর জীবনকে জগজ্জননীর পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া একটি ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই রাণী রাসমণির এক স্বপ্নকে কেন্দ্র ক'রেই না কি দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর মন্দিরের সূত্রপাত হয়। কাহিনীটা বলছি শোন।

নৌকায় কাশীধামে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিলেন রাণী রাসমণি। সকালে নৌকা ছাড়বে, রাত্রে নৌকাতেই বিশ্রাম করছিলেন তিনি। সেই রাত্রেই স্বপ্নে দেখা দিলেন তাঁর আরাধ্যা দেবী, আদেশ করলেন "কাশী যাবার প্রয়োজন নেই। গঙ্গা তীরে মন্দির গ'ড়ে তাতে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর, আমি তোর পূজা নেব।"

উপরের ঘটনাকে গল্প বললে ভুল হবে। মানুষের জীবনে এমন

অলৌকিক অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে হয় বৈকি। আমার কি মনে হয় তা বলছি। ৺মা-কালীর সেবার তীব্র বাসনা ছিল রাণীর অন্তর জুড়ে। তার সঙ্গে কাশীধাম যাত্রার পূর্বমুহূর্তে মিশে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে যাবার প্রচণ্ড বেদনা। এই তুই অনুভূতির ফল হচ্ছে উপরের স্বপ্ন। যাই হোক, স্বপ্ন দেখার পর, কাশী যাত্রা বাতিল করলেন রাণী। তাঁর তখন থেকে একমাত্র চিন্তা হ'ল স্বপ্নাদেশ প্রতিপালন করা।

স্বপ্ন সত্যিই একদিন বাস্তবে রূপায়িত হ'ল। ক'লকাতা থেকে চার মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে প্রায় ষাট্ বিঘা জমীর উপর গ'ড়ে উঠল মন্দির। রাণীর ভক্তি ছিল অপরিমেয়, অতুল ঐশ্বর্যেরও অধিকারিণী ছিলেন তিনি। বিরাট এই মন্দির ও তার সৌন্দর্য দেখেই পাওয়া যায় রাণীর ভক্তি ও ঐশ্বর্যের পরিমাপ। সুদীর্ঘ আট বৎসর লেগেছিল এই মন্দির তৈরী করতে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তুমি দেখেছো, সুতরাং তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। পঞ্চবটী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঘরে থাকতেন সে ঘর, তুইই তুমি অনেকবার দেখে এসেছো। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে এই পঞ্চবটী রচনা করেছিলেন। সেদিনের সে পঞ্চবটী আর নেই। নেই বাগানবাড়ীর উত্তর দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অতিপ্রিয় বিল্ববৃক্ষ। তবু গঙ্গাতীরের এই মন্দির আর বাগানকে ভোলা যায় না। বার বার মনে পড়ে জোয়ারে ফুলে উঠেছে ভাগীরথীর জল, সাদা পাল তুলে চ'লেছে নৌকার সার। ঘাটে ব'সে আসন্ন সন্ধ্যার সোনালী আলোয় শোন জলের কুলুকুলু ধ্বনি। মন্দিরে বেজে উঠবে কাঁসর-ঘণ্টার রোল। সব মিলিয়ে সে এক অপূর্ব পরিবেশ। মন নিজের অজান্তে ভেসে যাবে কোন সুদূরে, মাটির মানুষের চিন্তা আপনি মিশে যাবে অসীম আকাশের গভীর রহস্যে।

মনে রেখো যে এরপর আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা পাব এই পুণ্যভূমিতে।

মন্দির তো তৈরী হ'ল, কিন্তু বিপদ বাধলো মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য পূজারী নির্বাচনে। অনেক খোঁজাখুঁজি আর শাস্ত্রালোচনার পর শেষ পর্যন্ত গদাধরের দাদা রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে সম্মত হ'লেন। একের পর এক ঘটনা যদি লক্ষ্য কর তো দেখতে পাবে কি আশ্চর্য এবং অভূতপূর্ব উপায়ে বিশ্ববিধাতা ধীরে ধীরে গদাধরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সাধনার পীঠস্থানে। ঈশ্বরের লীলা শুধু বিচিত্র নয় বিস্ময়করও।

এইবার তা হ'লে আমরা আবার ফিরে যাই গদাধরের কাছে। যার জন্য এই বিরাট আয়োজন, কোথায় সেই তরুণ ব্রহ্মচারী? কি ভাবনা উঠেছে তার মনে?

আমরা দেখছি দাদা রামকুমারের এই রাণী রাসমণির মন্দিরে পূজারী হওয়া পছন্দ হয়নি গদাধরের। পছন্দ হয়নি কারণ তার মনে হয়েছিল যে শূদ্রের মন্দিরে পূজারী হ'য়ে দাদা কুলধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন। এই কারণেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত থাকলেও গদাধর সেখানে আহার করা তো দূরের কথা সেখানকার কোনও দ্রব্য স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। গদাধরের এই মনোভাব সামান্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বাল্যে আমাদের মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে পিতা ও মাতার প্রভাব। গদাধরের মনেও আঁকা ছিল পিতার আদর্শ। দেখা ছিল পিতা আজীবন সযত্নে শূদ্রের যাজন ও প্রতিগ্রহ পরিহার করেছেন। স্বভাবতই তাই মনে হয়েছিল যে দাদার কাজ স্বর্গীয় পিতার আদর্শের বিরুদ্ধে আঘাত। তরুণ ব্রহ্মচারীর বিচারে শাস্ত্রের চেয়ে সত্যাদর্শ বড় হয়েছিল।

রাণী রাসমণির অনুরোধে রামকুমার মন্দিরে প্রত্যহ পূজার ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন। ফলে সেখানেই থাকতে হ'য়েছিল তাঁকে। গদাধর কি করে! দাদার কাছ থেকে দূরে একা একা কতদিন থাকা যায়! বাধ্য হ'য়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে বসবাস শুরু হ'ল তার। কিন্তু আহারের ব্যাপারে নিজের সঙ্কল্পে দৃঢ় রইল তরুণ ব্রহ্মচারী। প্রাপ্ত সিধা নিয়ে নিজের হাতে গঙ্গাতীরে রান্না ক'রে দৈনন্দিন আহারের ব্যবস্থা ক'রে নিল সে।

আগামী দিনের শ্রীরামকৃষ্ণের এই গোঁড়ামিটা হয়তো তোমার কাছে একটু খাপছাড়া লাগছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে এর মধ্যে ছিল তরুণ গদাধরের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচারনিষ্ঠার প্রতি গভীর ঐকান্তিকতা। তখনও পর্যন্ত তরুণ অন্তরে যেটুকু সত্য ব'লে জানা ছিল তাই প্রবল শক্তিকে ধারণ ক'রে থাকাই ছিল এই কর্মের পিছনকার প্রেরণা। এই জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় নিষ্ঠা ছিল বলেই আমরা দেখতে পাই সাধনার পথে এগিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করছেন সর্ব-বন্ধন-মুক্তির বাণী।

এইবার গ্রাম্য বালক গদাধর ব'সেছে দক্ষিণেশ্বরে। এইবার শুরু হবে শ্রীরামকৃষ্ণে রূপান্তরের পর্ব। তাই এখন থেকে আমার চিঠিতে থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ। আর গদাধর নয়, আমাদের সামনে এবার যিনি এসে দাঁড়াবেন তিনি যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ নাম নিয়ে নানা মতান্তর আছে। কারও মতে এই নাম মথুরবাবুর দেওয়া। আবার কেউ কেউ বলেন তোতাপুরীর দেওয়া এই নাম। এমনও শোনা যায় যে রামকৃষ্ণই এই মহাপুরুষের পিতৃদত্ত আসল নাম, গদাধর ছিল তাঁর ডাকনাম। শেষের মতটা সত্যি হওয়া আশ্চর্য নয়। ক্ষুদিরামের পুত্রকন্যাদের নামের আগে

'রাম' শব্দ আমরা দেখেছি যেমন রামকুমার, রামেশ্বর, রামশীলা ইত্যাদি। সুতরাং 'রামকৃষ্ণ' পিতৃদত্ত নাম হওয়াই স্বাভাবিক।

সকলেরই জ্ঞান হ'তে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জ্বলবে।

কারুর চৈতন্য হ'য়েছে। তার কিন্তু লক্ষণ আছে ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। আর ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু বলতে ভাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, নদী সব তাতে জল র'য়েছে; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবে না।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(৬)

আগের চিঠিতে ব'লেছি যে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন মনে ঘোর বিতৃষ্ণা নিয়ে। এই বিতৃষ্ণার অন্তর্নিহিত কারণও ব'লেছি। কিন্তু প্রকৃতির উদার সুন্দর রূপ, গঙ্গার তীরে মন্দিরের শান্ত, শীতল পরিবেশ, শীঘ্রই এক নূতন আনন্দের সন্ধান এনে দিল শ্রীরামকৃষ্ণের মনে। ক'লকাতার কোলাহল থেকে আবার যেন কামারপুকুরের গ্রাম্য-জীবনে ফিরে গেলেন তিনি। তুমি অবশ্য দক্ষিণেশ্বর অনেকবার দেখেছো। কিন্তু মনে রেখো যে আমি ব'লছি প্রায় একশো পাঁচ বছর আগের দক্ষিণেশ্বরের কথা। তখন দক্ষিণেশ্বর ছিল এক সাধারণ গণ্ডগ্রাম ; সহর ক'লকাতার সঙ্গে তার বিশেষ কোনও যোগ ছিল না বললেই হয়। হয় পায়ে হেঁটে আর নয়তো ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে যেতে হ'ত ক'লকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর।

থাকবার জায়গা তো হ'ল, জায়গাটা পছন্দও হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের। কিন্তু নরদেহ ধারণ করলে চাই আহার, পোষাক ইত্যাদি। সাধনায় ডুবে যাবেন যিনি তাঁর জন্যে কে করবে এইসবের ব্যবস্থা। আমাদের কথায় বলে না—যে খায় চিনি, তাকে জোগান চিন্তামণি। অর্থাৎ শুভকাজে যে হাত দেবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনার চেয়ে বেশি মিষ্টি আর কোন্ চিনি, এত শুভ্র, সুন্দর আর কোন্ কাজ ? তাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঈশ্বরই করলেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হ'ল তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রাম, মামার সেবার ভার সাগ্রহে কাঁধে তুলে নিল সে।

সেবার ব্যবস্থা না হয় হ'ল কিন্তু সেবার উপকরণও তো চাই। মানুষের দেহ নিয়ে বাঁচতে হ'লেই মেটাতে হবে নানা পার্থিব

প্রয়োজন। একজন সাধকের সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু একেবারে এই প্রয়োজনশূন্য কোনও মানুষই হ'তে পারে না। এখানেও দেখা দিল ঈশ্বরের মঙ্গলস্পর্শ। অযাচিতভাবে এগিয়ে এলেন রাণী রাসমণির জামাই মথুরানাথ-যাঁকে এরপর থেকে আমি বলবো মথুরবাবু, এই মহানুভব ব্যক্তিটির বহু পরিচিত নাম।

সুদর্শন তরুণ শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন-ভোলা ভাবে গঙ্গার তীরে বেড়াতে দেখেছিলেন মথুরবাবু। প্রথম দেখাতেই বড় ভাল লেগেছিল তাঁর এই কমনীয়কান্তি তরুণকে। খোঁজ নিয়ে পরিচয়ও জেনেছিলেন। মন্দিরের কাজ, মায়ের পূজার জন্য পূজারীর প্রয়োজন। এই তো রয়েছে সেই পূজারী—বার বার মথুরবাবুর মনে হ'ল। মনে হ'ল এমন পূজারী না পেলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মায়ের পূজা। অবশেষে তিনি প্রস্তাব করলেন দাদা রামকুমারের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পে অটল—কারুর চাকরি করবেন না, ভগবান ভিন্ন কারুর সেবা করবেন না। তবুও হাল ছাড়লেন না মথুরবাবু, সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

এসেও গেল সেই সুযোগ। একদিন গঙ্গার তীরে নিজের হাতে মাটির একটি শিবমূর্তি গ'ড়ে একমনে পূজা করছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পিছনে এসে দাঁড়ালেন মথুরবাবু। অনিন্দ্যসুন্দর সেই শিবমূর্তি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন তিনি, আর দেখলেন তরুণ শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানগম্ভীর সৌম্য ভাব। আরাধনার মধ্যে এমন গভীর ভাবে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না কি ? ফিরে ফিরে মনে এল এই প্রশ্ন আর বার বার সামনে দেখলেন প্রশ্নের জ্বলন্ত উত্তর। শিবমূর্তিটি হৃদয়ের মারফত সংগ্রহ ক'রে তিনি তা দেখালেন রাণী রাসমণিকে। রাণীও মুগ্ধ হ'লেন। তখন থেকে মথুরবাবুর একমাত্র

চিন্তা হ'ল যেমন ক'রে হোক মায়ের পূজার কাজে জুড়ে দিতে হবে এই তরুণ তপস্বীকে।

তরুণ তপস্বীই বটে, তা না হ'লে মথুরবাবুর প্রস্তাব শুনে প্রথমেই বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিগ্রহের সজ্জা অর্থাৎ মূল্যবান গহনা ইত্যাদির খবরদারি করা তাঁর পে'ষাবে না। অর্থাৎ তাঁর মনের কথা হ'ল—মায়ের পূজায় তো লাগতেই চাই কিন্তু চাই শুধু পূজাটুকুই সার করতে, অলঙ্কারের আবর্জনায় মজে যেতে চাই না। তাতে রাজী হ'লেন মথুরবাবু। শ্রীরামকৃষ্ণ হ'লেন মন্দিরের বেশকারী আর হৃদয়রাম পেলেন পূজার ব্যাপারে দুই ভাইকে সাহায্যের ভার।

এর অল্প দিন পরেই আর একটা ঘটনা ঘটল। পুরোহিতের হাত থেকে প'ড়ে ভেঙ্গে গেল ৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজী বিগ্রহের একখানি পা। পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন--ভাঙ্গাবিগ্রহ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হোক। বিধান শুনে প্রাণে আঘাত পেলেন ভক্তিমতী রাণী রাসমণি। রাণীর যখন এমনই দিশেহারা অবস্থা, মথুরবাবু ডাকলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। বিধান দিতে গিয়ে পণ্ডিতদের পথেও গেলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। সোজা জানতে চাইলেন—রাণীর জামাই পা ভাঙ্গলে কি হ'ত? তাঁকে কি সরিয়ে দিয়ে আনা হ'ত নতুন জামাই? হ'ত না, হ'ত তাঁর চিকিৎসা। এক্ষেত্রেও তাই করা হোক্। ভাঙ্গা পা জুড়ে আবার সিংহাসনে বসানো হোক্ বিগ্রহকে। বিধান শুনে তৃপ্ত হ'লেন রাণী। নিজের হাতে নিপুণভাবে বিগ্রহের ভাঙ্গা পা জুড়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু তাই নয়, রাধাগোবিন্দের পূজার ভারও নিলেন তিনি।

এখানে যেটা লক্ষ্য করবার সেটা হচ্ছে মা সত্য তা সহজ এবং সরল হ'তে বাধ্য। পণ্ডিতদের মত পুঁথি না পড়লেও সেই সত্যকে ধরা যায় ভক্তি এবং নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তরুণ তপস্বী শ্রীরামকৃষ্ণ

এই সন্ধান পে'য়েছিলেন আর তাই আজীবন তিনি যা ব'লেছেন বা যা ক'রেছেন সবকিছুর মধ্যেই ছিল শিশুর সরলতা আর প্রকৃতির সহজ ভাব।

বেশ চলল কিছুদিন। রামকুমারের স্বাস্থ্য কিন্তু ইতিমধ্যে ভেঙ্গে পড়েছিল। ছোট ভাইকে কালীমন্দিরের পূজার ভার দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছিলেন তিনি। প্রস্তাব করতেই রাজী হ'য়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রাধাগোবিন্দের পূজার মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি পেয়েছিলেন এক পরমরসের সন্ধান। সাগ্রহে দাদার কাছে শিখতে লাগলেন কালীপূজার জটিল পদ্ধতি, আসনমুদ্রা ইত্যাদি। তারপরই এল দীক্ষার প্রশ্ন। শক্তিপূজার অধিকারী হ'তে গেলে মন্ত্র নিয়ে অভিষিক্ত হ'তে হয়। ক'লকাতার বৈঠকখানা পাড়ায় বাস করতেন এক প্রবীন সাধক কেনারাম ভট্টাচার্য। তাঁর কাছে দীক্ষিত হ'লেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

৺কালীপূজার ভার নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আবার এ'ল মৃত্যুর আঘাত। শ্যামনগর-মুলাজোড়ে একটা কাজের জন্য গিয়েছিলেন রামকুমার; সেখানেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হ'ল। বাবার মত স্নেহে আর আদরে শ্রীরামকৃষ্ণকে পালন ক'রেছিলেন দাদা রামকুমার। সেই দাদার মৃত্যুতে সংসার অসার ব'লে মনে এ'ল তাঁর। অন্তরের বৈরাগ্যভাব তীব্রতর হ'য়ে উঠল। সব ছেড়ে তিনি চাইলেন শান্তি, মাতলেন মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হ'য়ে অমৃতলাভের কঠিন সাধনায়।

অনুরাগ হ'লে ঈশ্বরলাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হ'লে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়।

বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন। —শ্রীরামকৃষ্ণ

(৭)

আগের চিঠির ঘটনাগুলো একটু মন দিয়ে পড়লেই লক্ষ্য করবে যে ঈশ্বরের কি বিচিত্র বিধানে ধাপে ধাপে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে বসলেন মা ভবতারিণীর পায়ের তলায়। কোথায় ভেসে গেল তাঁর আগেকার সঙ্কল্প। কিন্তু তিনি পূজার ভার নিয়েছিলেন অর্থ বা অন্য কিছুর লোভে নয়, কখনই নয়। আগেই ব'লেছি পূজার মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন পরমানন্দের আস্বাদ। দাদার মৃত্যুর পর থেকেই ভিন্ন খাতে বইতে লাগলো তাঁর অন্তরের আকুলতা। তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ অর্থাৎ সেই অবস্থায় যাওয়া যে অবস্থায় মানুষের পক্ষেও মৃত্যুকে তুচ্ছ করা সম্ভব, সম্ভব পরমা শান্তি লাভ।

মোটকথা হচ্ছে যে শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজার ভার নেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেই মাটির মায়ের মধ্যে জগন্মাতার দেখা পাওয়া। দাদার মৃত্যুর পর মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—বিশ্ব যিনি পালন করছেন সেই মা যদি সত্য হন্ তা হ'লে দেখতে হবে তাঁকে, কইতে হবে কথা তাঁর সঙ্গে; আর তা যদি না পারেন তবে এই বিরাট মন্দির এই সুন্দর প্রতিমা, এত পূজার সমারোহ—সবই বৃথা।

শুরু হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার প্রথম পর্ব। এইখানে একটা কথা ব'লে রাখি। ঈশ্বরলাভের জন্যে যে সাধনা, যাকে আমরা বলি আধ্যাত্মিক সাধনা, তা হচ্ছে মানুষের অন্তরের ব্যাপার। বাইরের দিক থেকে বিচার ক'রে এর পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সাধনার পথে যিনি অগ্রসর হন, তাঁর কথা-বার্তা, ধরণ-ধারণ সবই আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরপ্রেরিত

পুরুষ, তাঁর সাধনার গতিপথ নির্ণয় করা, তাঁর উপলব্ধির মর্মোদ্ধার করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। তবু কি কিছু নেই জানবার? নিশ্চয়ই আছে। আছে সেইটুকুই যা এই করুণাঘন মহাপুরুষ নিজের মুখে ব'লেছেন তাঁর শিষ্যদের। বড় হয়ে তুমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি বই পড়ে এই সাধনার কিছু পরিচয় পাবে। আমি এখানে শুধু সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলবো; যাতে পরবর্তী জীবনে "কথামৃত" হৃদয়ঙ্গম করায় তোমার সুবিধা হয়।

আগেই তোমায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার কথা বলেছি। সাধনার প্রতি পদে তাঁর লক্ষ্য ছিল, যে বিষয়ে মনোনিবেশ করবেন, তার শেষ পর্যন্ত সম্যক ভাবে না জেনে কিছুতেই নিবৃত্ত হবেন না। তাই মা ভবতারিণীর পূজা আরম্ভ ক'রেই তিনি চাইলেন তার মুলতত্ত্বে পেঁ ছিতে। তাঁকে পথ দেখাবার কেউ ছিলনা। জানা ছিল শুধু পূর্ব পূর্ব সাধকদের, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের সাধনার কিছু কিছু কাহিনী। সেই পথই ধরলেন তিনি—আকুলতার পথ, আর্তির পথ। কণ্ঠে হয় ধ্বনিত হচ্ছে রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের গান আর নয়তো শুধু আকুলস্বরে 'মা' 'মা' ডাক। শুধু চোখের জল আর আকুল মিনতি "মা, দেখা দে। রামপ্রসাদকে যেমন দেখা দিয়েছিলি,—তেমনি তোর এই অবোধ সন্তানকে দেখা দে।"

অবিশ্রান্ত কান্না আর ব্যাকুল প্রার্থনায় কেটে যায় দিন, আসে গভীর রাত্রি। তখন শুরু হয় শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ও যোগাভ্যাস। কামারপুকুরে শোনা তীর্থযাত্রি সন্ন্যাসীদের উপদেশ কাজে লেগে যায়। মন্দিরের উত্তরে ঘন জঙ্গলে এক আমলকী-গাছের তলায়, নিশ্ছিদ্র নীরবতার মাঝে চলে ধ্যানধারণা। কল্পনা করতে পারো,

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তি, আমলকী-গাছের তলায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ব'সে আছেন তিনি, নিশ্চল দেহে বস্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই, এমন কি উপবীত পর্যন্ত গলায় নেই। অষ্টপাশ, এই কথাটা তুমি হয়তো শুনেছো। অতীতে মুনি-ঋষিরা ব'লে গেছেন—ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি, অভিমান এই আটটি পাশ অর্থাৎ বন্ধনে জন্মাবধি মানুষ বাঁধা থাকে। এইসব ব'ন্ধন থেকে মুক্ত হ'লে তবেই মুখোমুখি হওয়া যায় ঈশ্বরের। তাই ধ্যানে বসবার আগে বস্ত্র ত্যাগ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ বিসর্জন দিতেন লজ্জা, উপবীত ত্যাগ ক'রে মন থেকে দূর করতে চাইতেন অভিমান, ব্রাহ্মণত্বের অভিমান।

মা ভবতারিণীর দর্শনের জন্য দিন দিন ব্যাকুল হ'য়ে উঠতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সে ব্যাকুলতা কেমন তা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন—"তিন টান একত্র না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান—এই তিন টান একসঙ্গে যদি কারো হয়, তবেই সে ব্যক্তি ঈশ্বরকে পায়।" শুধু মুখেই বলেননি, নিজের সাধক-জীবনে রেখেছিলেন সেই তিন টান একত্র হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দিবারাত্রি ডেকেও কিন্তু দেখা পাচ্ছেন না। মনে দারুণ অভিমান হ'ল। মনে হ'ল—মায়ের দেখাই যদি না পেলাম তা হ'লে আর এ জীবন রেখে লাভ কি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল মন্দিরের কোণে রাখা শাণিত খড়্গের প্রতি। ছুটে গেলেন তুলে নেবেন, সেই অস্ত্র, এক আঘাতে সব ব্যর্থতার শেষ ক'রে দেবেন। ঠিক তখনই কি হ'ল বলতো?

তুমি যখন 'মা' 'মা' ক'রে কাঁদো, শুধু বায়নার কান্না হ'লে তোমার মা শুনেও শোনেন না। কিন্তু যদি আঘাত পাও দেহে বা মনে আর তখন যদি ব্যাকুলস্বরে ডাকো মাকে, মা ঠিকই ছুটে

আসেন, কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন, দেন কত সান্ত্বনা। মা ভবতারিণীও শ্রীরামকৃষ্ণের আকুলতার এই চরম লগ্নে আর স্থির থাকতে পারলেন না। মা তাঁর জ্যোতির্ময়ী বরাভয়া মূর্তিতে দেখা দিলেন স্নেহের সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণকে।

একবার দেখা পেয়েই তৃপ্ত হবার মত বোকা ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ নন্। মায়ের কোলে চ'ড়ে ব'সবেন তিনি, কিছুতেই নামবেন না সেই সর্বদুঃখহর আসন থেকে। এইসময় তাঁর আহারনিদ্রা দূর হ'য়ে গেল। বুক লাল টক্‌টক্ করছে, চোখ দুটি পলকহীন, আর জবাফুলের মত রাঙা, কখনও বা সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা, কখনও বা ধ্যানে মুহ্যমান। এমন দুরন্ত স্নেহের কাঙাল ছেলেকে মা কি কোলে তুলে না নিয়ে থাকতে পারেন!

এই সময়ের শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলনা করা চলে এক শিশুর সঙ্গে। মায়ের সঙ্গেই তাঁর খেলা, মায়ের সঙ্গেই যত মনের কথা। পূজার ঘরে ব'সে পূজা করেন না, গান করেন, হাসেন, কাঁদেন। কত লোক ব'লেছে পাগল। পাগল ঠিকই, তবে সাধারণ পাগল নন। 'ভাবের পাগল'। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধকজীবনের বর্ণনা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার নেই। কত ঘটনাই না ঘটেছে, কত অদ্ভুত রূপে তাঁকে দেখা গেছে দিনের পর দিন। নিজের মুখে তিনি পরবর্তী জীবনে শিষ্যদের কাছে বলেছেন এমন কত সব ঘটনার কাহিনী। তাঁর মুখের ব্যাখ্যা এবং যুক্তি না শুনলে এইসব ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝাও সম্ভব নয়। বড় হ'য়ে তুমি নিশ্চয়ই পড়বে সব। এখানে শুধু আমি একটা ঘটনা শোনাচ্ছি।

একদিন মন্দিরে ব'সে রাণী রাসমণি-কে গান শোনাচ্ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিভোর হ'য়ে গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি; হাত বাড়িয়ে রাণীর গায়ে আঘাত দিয়ে প্রায় ধম্‌কে উঠলেন

"এখানেও ওই চিন্তা!" অর্থাৎ মন্দিরে ব'সে মধুর মাতৃসঙ্গীত শুনতে শুনতেও বিষয়ান্তরে চ'লে গিয়েছিল রাণীর মন। তিনি ভাবছিলেন একটা মোকদ্দমার কথা। একবার ভেবে নাও অবস্থাটা —সকলের সামনে স্বয়ং রাণী রাসমণিকে শুধু ধমক দেওয়া নয়, অঙ্গে আঘাত ক'রে তাঁকে সচকিত করার চেষ্টা। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও পূজারীর পক্ষে কি সম্ভব ছিল এমন কাজ? মোটেই না। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং রাণী রাসমণির মনোভাবের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো।

স্থান, কাল বা পাত্র সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চেতনা থাকলে, এক কথায় বিন্দুমাত্র অহংজ্ঞান থাকলে এমন কাজ করা সম্ভব ছিল না শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে। শিশু রামকৃষ্ণ, মায়ের সন্তান রামকৃষ্ণ— নিজেকে তিনি জগন্মাতার হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না। আর রাণী রাসমণি—কি গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা, কি কঠোর আত্মসংযম এই ভক্তিমতী নারীর! তিনি সেদিন লজ্জিত হ'য়েছিলেন নিজের আচরণে, অন্যদের ব'লেছিলেন "ওঁর কোনও দোষ নেই, তোমরা ওঁকে কিছু বলোনা।"

দীর্ঘ চার বৎসর চ'লেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার এই প্রথমপর্ব। অবাক হ'য়ে হয়তো ভাবছো—এত সময়! এম. এ. পাশ করতে সময় লাগে না? ছাত্রের অধ্যয়নের তপস্যার চেয়ে অনেক দুর্গম, অনেক দুরূহ এই ঈশ্বরলাভের সাধনা। এম. এ. পাশের মত সাধনারও নানা স্তর আছে, আছে নানা বিষয়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়ে ছাত্রেরা কেউ সাহিত্য, কেউ অর্থনীতি, কেউ দর্শন— কিন্তু লক্ষ্য সেই একই, এম. এ. পাশ ক'রে জ্ঞান লাভ করা। সাধনার ক্ষেত্রেও কতকটা সেইরকম বলা যায়। শাস্ত্রে নানা রকম প্রণালীর কথা আছে যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,

তাছাড়া আছে জ্ঞানের পথ আর ভক্তির পথ। কিন্তু প্রণালী আর পথ বিভিন্ন হ'লেও, লক্ষ্য সেই একই-ঈশ্বরলাভ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের কাছে দাস্যভাবের প্রশংসা ক'রে বলেছেন "হে ঈশ্বর। তুমি প্রভু, আমি দাস—এ ভাবটির নাম দাস্যভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভাল।"

শুধু মুখের কথাই বলেন নি শ্রীরামকৃষ্ণ। নিজের জীবনে একের পর এক প্রণালী অভ্যাস করেছিলেন, প্রত্যেক পথটি ধ'রে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল বৈজ্ঞানিকের মনোভাব, তাঁর কার্যপ্রণালীও ছিল সম্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত। যাবতীয় তত্ত্ব নিজের জীবনে উপলব্ধি করবো, বিভিন্ন পথ আর প্রণালীর কার্যকারিতা নিজে দেখবো পরীক্ষা ক'রে—এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

সব মিলিয়ে একটা কথাই বার বার মনে হয় যে ধর্মের ব্যাপারে কোনও হেঁয়ালিকে আমল দিতেন না শ্রীরামকৃষ্ণ, কোনও বুজরুকিও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর প্রতিটি উপদেশ উপলব্ধির আলোয় উজ্জ্বল, আন্তরিকতার রসে মধুর। ভক্তির পথে সন্তানের ভাব নিয়ে সাধনা ক'রেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সেই সাধনার সম্পদ দু' হাত উজাড় ক'রে বিলিয়েছিলেন বিশ্ববাসীর কল্যানে।

সাধনার দুর্গম পথে চলতে চলতে, কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতার ফলে ভেঙ্গে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর। চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল কিন্তু ফল বিশেষ হ'ল না। এর ওপর আবির্ভূত হ'লেন অশেষ শাস্ত্রতে পণ্ডিত খুড়তুতো ভাই রামতারক—ডাক নাম হলধারী। বার বার এই হলধারীর অবজ্ঞার সম্মুখীন হ'তেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর মনে তাঁর পড়তো সন্দেহের ছায়া। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন হলধারী যে শ্রীরামকৃষ্ণ যা ক'রেছেন সব বৃথা, যা জেনেছেন সব

ভুল। শেষে তিনি ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন মায়ের পায়ে "মা, নিরক্ষর মুখ্খু ব'লে আমাকে কি এমনি ক'রে ফাঁকি দিতে হয়।" তারপর শোনো ঠাকুরের কথামৃত "সে কান্নার তোড় আর থামে না। কুঠিরঘরে ব'সে কাঁদছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেজে হ'তে কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠে সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হ'য়ে গেল। তারপর দেখি তাহার ভিতর বুক পর্যন্ত দাড়িতে ঢাকা একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত মুখ! ঐ মূর্তি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠলেন— 'ওরে তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্।' তিনবার মাত্র ঐ কথাগুলি ব'লেই মূর্তি ধীরে ধীরে আবার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল এবং কুয়াশার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। ঐরূপ দেখে সে'বার শান্ত হ'লাম।"

মন শান্ত হ'ল বটে কিন্তু দেহ সুস্থ হ'ল না। এখানে ব'লে রাখি যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে হলধারীর মত বেদান্তবাদী পণ্ডিতের আসা প্রয়োজন ছিল। হলধারীর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে নিজের জীবনে তা পরীক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, হলধারীর কাছে শোনা শাস্ত্রকথা ও শাস্ত্রীয় উপমা পরবর্তী জীবনে উপদেশ দেবার সময় তাঁর বিশেষ কাজে লেগেছিল।

ওধারে কামারপুকুর থেকে আসছিল মায়ের ডাক, অসুস্থ সন্তানকে কোলে নিয়ে স্নেহযত্নে সারিয়ে তুলতে চাইছিলেন চন্দ্রাদেবী। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কামারপুকুরে, মায়ের কাছে ফিরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিষকে চাচ্ছে তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি

ঘাট আছে ; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে কলসী ক'রে—বলছে "জল"। মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে, চামড়ার ডোলে ক'রে—তারা বলছে "পানী"। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে—তারা বলছে "ওয়াটার" (Water)।

……তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া ; ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, কাটাকাটি ; এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে, আন্তরিক হ'লেই, ব্যাকুল হ'লেই তাঁকে লাভ করবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(৮)

তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই যে অসুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘকাল পরে কামারপুকুরে ফিরে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যাঁরা তাঁদের পরিচিত গদাধরকে দেখবেন ব'লে আশা ক'রেছিলেন তাঁরা অবশ্যই হতাশ হ'লেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে সদাই বিষণ্ণ ভাব, কি যেন খুঁজছেন তিনি। একা একা ঘুরে বেড়ান, কারুর সঙ্গে মেলামেশা করেন না, বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না। গ্রামের প্রান্তে 'ভুতির খাল' শ্মশানে অধিকাংশ সময় কেটে যেত তাঁর। শুধু দিনে নয় রাত্রেও যেতেন সেই শ্মশানে। যতদূর মনে হয়, লোকচক্ষু থেকে দূরে, নির্জনে তখনও চলছিল তাঁর ধ্যান-ধারণা।

চন্দ্রাদেবী প্রথমটা চিন্তায় পড়েছিলেন, ছেলের মানসিক অবস্থা তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু ক্রমশ ফিরে এল শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বেকার কথাবার্তা, হাসি-রঙ্গ। চন্দ্রাদেবী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে ভয়ের রেশ অবশ্য গেল না। ভয় যে, আবার ছেলের যদি মতিগতির বদল হয়, আবার যদি সংসার ছেড়ে দূরে চ'লে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মনে যে চিন্তাটি আসবার তাই এলো। স্থির করলেন ছেলের বিয়ে দেবেন, তা হ'লেই সংসারে বাঁধা পড়বে তার মন। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন তেইশ বৎসর।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে মা প্রস্তাব করতেই রাজী হ'য়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু রাজীই হ'লেন না, আসন্ন উৎসবের আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হ'লেন। কেন এমন হ'ল? সন্ন্যাসীরা ঘর-সংসার ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করেন, এই তো আমরা জানি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা কিন্তু ঠিক সন্ন্যাসীর ভূমিকা নয়।

প্রত্যক্ষ মানবকল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন তিনি, পাপী-তাপী সংসারী মানুষকে শান্তির বাণী শোনাবেন ব'লে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাই তাঁর সাধনার আসন বাংলাদেশে নব-জাগরণের পীঠস্থান ক'লকাতা সহরের প্রান্তে, তাই তাঁর জীবন সংসারীর জীবনের পরম আদর্শের প্রতীক। হয়তো জগদম্বার আদেশ পেয়েছিলেন তিনি। অথবা এই বললেই বোধহয় ঠিক হবে যে মায়ের মুখেই তিনি শুনেছিলেন জগন্মাতার আদেশ।

পাশের গ্রাম জয়রামবাটীর গৃহস্থ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদামণির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। সারদামণির বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর।

এইখানে এই সুযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মা চন্দ্রাদেবী আর পত্নী সারদামণির প্রভাব সম্বন্ধে সামান্য কিছু ব'লে রাখি। এরপর আসবেন অনেক সাধক আর সাধিকা, আসবেন অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। সেই ভীড়ে হয়তো আড়ালে প'ড়ে যাবেন এই দুই প্রণম্যা নারী, যাঁরা আড়ালে থেকেও জুড়ে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এক বৃহৎ অংশ, যাঁরা নীরব মঙ্গল-কামনা আর অতন্দ্র সেবা দিয়ে ভ'রে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অমৃতভাণ্ড।

মা চন্দ্রাদেবীকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে আজীবন পূজা ক'রেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়ের কাছ থেকে দূরে চ'লে এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু নিজেই বলেছেন "যে মা মন্দিরে র'য়েছেন, তিনিই এই দেহকে জন্ম দিয়েছেন, এবং এখন নহবৎখানায় বাস ক'রছেন।" এই নহবৎখানা হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের লাগোয়া নহবৎখানা। গ্রামে বৃদ্ধা মায়ের সেবার ত্রুটি হচ্ছে এ কথা মনে হওয়া মাত্রই দক্ষিণেশ্বরে চন্দ্রাদেবীর বাসের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন কর্তব্য-পরায়ণ পুত্র। এই দক্ষিণেশ্বরেই ৮৫ বৎসর বয়সে শেষনিশ্বাস

ত্যাগ করেন চন্দ্রাদেবী। মায়ের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সেবা ক'রেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপর মৃতা জননীর তর্পন করতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না, শাস্ত্রবিহিত এই কর্ম করা আর সম্ভব হ'ল না। দেহ-মন তখন তাঁর ছিন্ন ক'রেছে লৌকিক জীবনের সব বন্ধন, তাই অসাড় হাত গ'লে পড়ে গেল সব জল। তখন কি কান্না ছেলের। চোখের জল দিয়ে শেষ অঞ্জলি দিলেন মায়ের আত্মার উদ্দেশে।

আর সহধর্মিণী সারদামণি! বিবাহের রাত্রেই তাঁর শুরু হ'য়েছিল ত্যাগের শিক্ষা। নববধূকে গহনা দেবেন এমন সঙ্গতি ছিল না চন্দ্রাদেবীর। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের কাছ থেকে ধার ক'রে কিছু গহনায় সাজিয়েছিলেন উৎসবের দিনে। বালিকাবধূর গা থেকে সেই গহনা খুলে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, ভাবতেই ব্যথা পাচ্ছিলেন স্নেহময়ী শ্বাশুড়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের দুশ্চিন্তা দূর করলেন। ঘুমন্ত বধূর গা থেকে একটি একটি ক'রে খুলে নিয়ে, ফিরিয়ে দিলেন সেই অলঙ্কার। জেগে উঠে কি মনে ব্যথা পেয়েছিলেন সারদামণি? একটু পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাইরের আভরণ বিসর্জন দিয়ে চাইছিলেন তাঁকে অন্তরের সম্পদে সমৃদ্ধ করতে, এ কথা সেদিন বোঝবার সময় বা সুযোগ তাঁর হয়নি।

এরপর মা সারদামণি আবার স্বামীর সান্নিধ্যে এলেন দীর্ঘ আট বৎসর পরে। আবার অসুস্থ হ'য়ে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জয়রামবাটি থেকে এলেন মা স্বামীর সেবা করবেন ব'লে। কঠিন সাধনার ক্ষুরধার পথ অতিক্রম ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের তখন সদানন্দ অবস্থা। গ্রামের লোক আবার ফিরে পেল তাদের সেই ধ্যানে তন্ময়, স্নেহে আকুল, হাসিতে উচ্ছল, রঙ্গে উজ্জ্বল

গদাধরকে, অমৃতের পুত্রকে। আর এই সময়েই স্বামীর প্রেম, প্রীতি, স্নেহের অমৃত-সাগরে অবগাহনের সুযোগ পেলেন মা সারদামণি।

একজন সর্বত্যাগী ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষের জীবনে এই অপূর্ব জীবনাদর্শের বিকাশ শুনলে প্রথমটা একটু বিস্মিত হ'তেই হয়। তুমিও হবে আশা করছি। কিন্তু এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বোত্তম মহিমায় বিরাজমান। এইখানেই তিনি আমাদের সকলের নিকটতম, সবচেয়ে স্নেহঘন দেবতা—তোমার, আমার সকলের প্রাণের ঠাকুর। আগেই বলেছি যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও বিষয়ে মন দিলে তা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন না ক'রে ছাড়তেন না। মা সারদামণি তাঁর কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরম যত্নে ও স্নেহে নিজের জীবনে বরণ ক'রে নিলেন স্ত্রীকে। তারপর আরম্ভ করলেন স্ত্রীর শিক্ষা। শুধু ঈশ্বরলাভের পথেই হাত ধ'রে নিয়ে গেলেন না স্ত্রীকে, সংসারধর্ম সম্বন্ধেও তাঁকে সুনিপুণা করায় মন দিলেন। সংসারত্যাগী হ'য়েও সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। একদিন নিপুণভাবে শিবমূর্তি গ'ড়েছিলেন, এখন মানুষ গড়ার কাজে প্রয়োগ করলেন তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। অতিথির পরিচর্যা থেকে আরম্ভ ক'রে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নানা ব্যাপারে শিক্ষা দিলেন স্ত্রীকে! তারপর মা সারদামণিকে শোনালেন তাঁর অমৃতবাণী "চাঁদামামা যেমন সকলের মামা, ঈশ্বর তেমন সকলেরই আপনার জন। তাঁর নিকট প্রার্থনা করবার, তাঁর কাছে যাবার সকলেরই সমান অধিকার। যাঁরা তাঁকে ব্যাকুলভাবে ডাকে তিনি নিজে কৃপা ক'রে তাঁদের নিকট দর্শন দেন। তুমি যদি তাঁকে ব্যাকুলভাবে ডাক, নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাবে।"

সেই পরম মুহূর্তে সারদামণি তাঁর স্বামীর মধ্যে প্রত্যক্ষ

ক'রেছিলেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের ইষ্টকে। আর স্ত্রীর মধ্যে কি দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ?

এরপর আমরা দেখছি মাকে কখনো কামারপুকুরে বা জয়রাম-বাটিতে কিন্তু ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে দক্ষিণেশ্বরের স্বামীর সান্নিধ্যে। প্রথমবার পায়ে হেঁটে কামারপুকুর থেকে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। পথে জ্বর হ'য়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে যখন পৌঁছলেন তখন শরীর দুর্বল, রাতও বেশ হ'য়েছে। মথুরবাবুর তখন মৃত্যু হ'য়েছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। নিজেই সহধর্মিণীর সেবা ও শুশ্রূষা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু কি সেবাই করলেন। ফলহারিণী কালিকা পূজার রাত্রে দেবীজ্ঞানে পূজা করলেন মা সারদামণিকে। এই সময়েই একদিন তিনি মাকে ব'লেছিলেন "সত্যই আমি তোমাকে আনন্দময়ী মা'র প্রতিমূর্তি ব'লে জ্ঞান করি।" তাই সব সাধনার সমাপ্তিতে সাধনফল সমর্পণ করলেন সাক্ষাৎ মাতৃরূপী স্ত্রীর পাদপদ্মে। সব সাধনার শেষে শুরু হ'ল সাধনোত্তর পরমতম দাম্পত্যজীবন।

সেবার মা প্রায় দু'বছর ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। দ্বিতীয়বার কামারপুকুর থেকে আসবার সময় জনহীন প্রান্তরে একাকিনী মা প'ড়েছিলেন ডাকাতের হাতে। কিন্তু ডাকাতও তো মায়েরই সন্তান। মা'র স্নেহবিগলিত দৃষ্টির সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মত শান্ত হ'ল সেই দুর্দান্ত ডাকাত আর তার স্ত্রী। তারাই শেষে যত্ন ক'রে পথ চিনিয়ে মাকে পৌঁছে দিয়ে গেল দক্ষিণেশ্বরে। দ্বিতীয়বার এসে মা ছিলেন প্রথমে নহবৎখানায় তারপর তারই কাছে ছোট্ট একটি কুটিরে।

এরপর মাকে আমরা দেখেছি সেবাযত্ন স্নেহমায়ার প্রতিমূর্তি হ'য়ে ব'সে আছেন এই কুটিরে। তারপর তাঁকে দেখেছি আরও

কত পরিবেশ, দেখেছি কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে ধৈর্যের, স্তব্ধ সাধনার ঘনীভূত প্রতিমূর্তিরূপে। দেখেছি বেলুড়ের তাঁর সন্তান পরিবৃতা করুণাময়ী আনন্দরূপা মাতৃমূর্তি।

ভগিনী নিবেদিতার কথা তুমি শুনেছো। বাগবাজারে তাঁর নামে স্কুল র'য়েছে। এই বিদেশিনী ভক্তিমতী নারী বলেছেন "আমার সর্বদা একথা মনে হয় যে আদর্শ ভারত ললনা কেমনটি হওয়া উচিত—সে সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ মনে মনে যে ধারণা পোষণ করিতেন, মাতাঠাকুরাণী তাহারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। কিন্তু সত্যই কি তিনি শুধু একটি পুরাতন আদর্শের শেষ মূর্ত বিগ্রহ? একথা কি আমরা মনে করিতে পারি না যে তিনি এক নূতন আদর্শের স্থাপয়িত্রী?"

ভগিনী নিবেদিতার এই প্রশ্নের উত্তর আজ স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালব্দ মহাশক্তির সাকার প্রতিমূর্তি হচ্ছেন মা সারদামণি।

মা বাপ কি কম জিনিষ গা? তাঁরা প্রসন্ন না হ'লে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না।***কতকগুলি ঋণ আছে।······মাতৃঋণ, পিতৃঋণ···। মা বাপের ঋণ পরিশোধ না করলে কোন কাজই হয় না।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(৯)

এইবার ফিরে আসি আগের কথায়, চল কামারপুকুর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমরা ফিরে যাই দক্ষিণেশ্বরে। বিবাহের পর বেশ কিছুদিন কামারপুকুরে কাটিয়ে সুস্থ দেহ, সদাপ্রসন্ন অন্তর নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু পীঠস্থানে পা রাখতেই তীব্র হ'ল সাধনার আকর্ষণ। আবার শুরু হ'ল সেই ভাবোন্মাদ অবস্থা, সেই দিবারাত্র 'মা' 'মা' ডাক। কল্পনা কর আকুলতার প্রচণ্ড আবেগে সর্বাঙ্গে আগুনের জ্বালা। কল্পনা কর অপার বিস্ময়ে পড়ছে না চোখের পলক ; মায়ের মহিমায় বিস্মিত হ'য়েছেন সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি যদি ভালো ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখ, তা হ'লে দেখবে কি মধুর রূপে তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে এই বিস্ময়ের রেখা। শ্রীরামকৃষ্ণ তো শুধু সাধক নন, তিনি শিল্পী এবং কবি।

সাধনার একটা স্তরে পৌঁচচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হবার ব্যাকুল আগ্রহে। এক কথায় উন্মাদবৎ অবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণের। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কৃচ্ছ সাধনের পরিধি, এই শারীরিক নিগ্রহের প্রাবল্য ধারণা করাও সম্ভব নয়। নিজেই বলেছেন তিনি "আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর-মনে ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক, উহার এক-চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীরত্যাগ হয়।"

আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে এত ধারণা করা অসম্ভব যে কি তীব্র ইচ্ছা ও প্রবল ব্যাকুলতা নিয়ে সব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে

শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন এগিয়েছিলেন সিদ্ধিলাভের তুর্গম এবং ক্ষুরধার পথে।

এই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে পর পর তু'টো ঘটনা ঘটল, একটা নিয়ে এ'ল আনন্দ আর একটা দিয়ে গেল আঘাত। রাণী রাসমণির জামাই, ভোগে-সুখে পালিত জমিদার, মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে আশ্রয় নিলেন একান্ত ভক্তরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় মহিমা প্রথম বুঝেছিলেন এই মথুরবাবু, তাঁর প্রথম ভক্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে রাণী রাসমণির মৃত্যু।

ভক্ত না থাকলে কে উপভোগ করবে শ্রীভগবানের মহিমা? ভক্তের যেমন চাই ভগবানকে, ভগবানেরও তেমনি ভক্ত না হ'লে চলে না। মথুরবাবুকে কেন্দ্র ক'রে এই শুরু হ'ল ভক্ত ও ভগবানের লীলা। দামী শাল উপহার দিলেন মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে। সদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তা গায়ে জড়িয়ে খুশীতে ফেটে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দামী শাল মাটিতে ফেলে পায়ে মাড়িয়ে বললেন "এতে আর আছে কি? কতকগুলো ভেড়ার লোম বই ত নয়!...... এতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, বরঞ্চ গায়ে দিলে অভিমান বাড়ে, মনে হয়, আমি মস্ত একজন, অপর সকলের চেয়ে বড়। আর অভিমান-অহঙ্কার বাড়লেই মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে স'রে যায়। এতে এত দোষ।" খবরটা শুনে হেসে উঠলেন মথুরবাবু। অন্যকে যা মানায় না, তাঁর গুরুকে তা মানায়।

এই সময়েই গঙ্গার তীরে ব'সে তিনি হাতে টাকা আর মাটি নিয়ে একটার পর আর একটা ফেললেন গঙ্গাগর্ভে আর বার বার বললেন 'টাকা-মাটি, মাটি-টাকা।' এই প্রসঙ্গে নিজেই তিনি বলেছেন "তাঁকে পেলে সবাইকে পাব। টাকা মাটি, মাটিই টাকা।—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই ব'লে ত্যাগ কল্লুম। গঙ্গার জলে ফেলে

দিলুম। তখন ভয় হলো যে মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করলুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করেন। তখন বল্লুম 'মা, তোমায় চাই আর কিছুই চাই না' ; তাঁকে পেলে সব পাব।"

কি শিশুর সরলতা আবার তার পাশেই সাধকের কি জ্বলন্ত বিশ্বাস!

এখানে তোমার মনে অবশ্যই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—তাহ'লে আমরা সাধারণ সংসারী জীব কি করবো? আমরা তো আর অর্থ-কে তুচ্ছ করতে পারিনা। এর উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেই শোন।

ক'লকাতার এক ধনী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ভক্ত শম্ভু মল্লিক বলেছিলেন তাঁকে "এখন এই আশীর্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে সেগুলি সদ্ব্যায়ে যায়—হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি করা, রাস্তা-ঘাট করা, কুয়ো করা, এই সবে।" উত্তরে তিনি বলিলেন "এ সব কর্ম অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারলে ভাল; কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক্, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। হাসপাতাল ডিসপেন্সারি করা নয়। মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বল্লেন, তুমি বর লও। তা হ'লে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল ডিসপেন্সারি ক'রে দাও, না বলবে হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শ্রদ্ধা ভক্তি হয়।......তাঁকে লাভ হ'লে, তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাপাতাল-ডিসপেন্সারি হ'তে পারে।" আবার শোন কথামৃত "তাই বলছি, কর্ম আদিকাণ্ড। কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়।"

আমরা যারা ধনী শম্ভু মল্লিক নই, তাদের জন্যে তা হ'লে উত্তরটা কি? উত্তর হচ্ছে—কর্ম করতেই হবে এবং সেজন্যে প্রয়োজনীয় অর্থও চাই। কিন্তু অর্থই শেষে যেন অনর্থ না বাধায়,

প্রয়োজনটা যেন ক্রমশ না প্রসারিত হয় অপ্রয়োজনের গণ্ডীতে। আর প্রতিটি কর্মের লক্ষ্য যেন হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ।

আমি বুঝেছি, আর সব বোকা,—এ বুদ্ধি কোরো না। সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতেই সেই হরিই আছেন। তা ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহ্লাদ বললেন, যদি বর দেবে, তবে এই বর দেও, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের অপরাধ না হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(১০)

আগের চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ ক'রেছিলাম। দীর্ঘ আট বৎসর ধ'রে চলেছিল এই ঈশ্বরলাভের সাধনা। ঈশ্বরলাভের সাধনা বললে ঠিক বলা হবে না। মা ভব-তারিণীর কৃপা তিনি আগেই লাভ ক'রেছিলেন। কিন্তু শ্রীরাম-কৃষ্ণের সাধনা তো শুধু আত্মদর্শনের জন্য নয়। লোকহিতার্থে তাঁর আবির্ভাব; তাই বিভিন্ন সাধনার পদ্ধতি, বিভিন্ন মতবাদের সত্যতা নিজের জীবনে পরীক্ষা ও উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক পথেও যেতে হ'য়েছিল তাঁকে। এরপর আর্তমানবকে, উৎসুক ভক্তকে ডাক দেবেন তিনি, তাঁদের যা বলবেন তার একটা কথাও যেন না হয় পুঁথিগত বিদ্যা। তিনি বলবেন নিজের জীবনে যাচাই করা জ্বলন্ত সত্য।

পীঠস্থান দক্ষিণেশ্বর ইতিমধ্যেই সাধুসন্ন্যাসীদের আকর্ষণ করছিল। আগে এইরকম কোনো আগন্তুক সাধুর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ হটযোগ শি'খেছিলেন, অভ্যাসও ক'রেছিলেন। কিন্তু ওই যোগপ্রণালী তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি ব'লেই মনে হয়। তারপর তাঁর জীবনে এসেছিল ভক্তিভাবের প্রবল বন্যা। কিন্তু তখনও বাকী ছিল কিছু। সম্ভবত উপযুক্ত গুরুর প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি। এই দ্বিতীয় পর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শুরু হল একাধিক তেজোদীপ্ত সিদ্ধ পুরুষ ও নারীর আবির্ভাব।

প্রথম, দক্ষিণেশ্বরে এলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী। শোনা যায় যে ঈশ্বরাদিষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভে সাহায্য করতে এসেছিলেন এই ভৈরবী। এই ভৈরবীই প্রথম লক্ষ্য ক'রেছিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে সিদ্ধপুরুষের সব অসামান্য লক্ষণ। শুধু তাই নয় তাঁরই নির্দেশমত চিকিৎসায় দূর হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরের জ্বালা। তারপর মায়ের স্নেহে তন্ত্রসাধনার দুর্গম পথে শ্রীরামকৃষ্ণকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ভৈরবীর আবির্ভাবের যেটা সবচেয়ে বড় ঘটনা সেটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর অবতার-পুরুষ হিসাবে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা। যতদূর মনে হয় ভৈরবীর আবির্ভাবের আগে শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ মাহাত্ম্য গোপন ছিল। পণ্ডিতসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্যত্ব যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন এই ভৈরবী। এবং এইসময় থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ মহিমা লোকমুখে প্রচারের শুরু। এইক্ষণ থেকে সাধুসন্ত ও ধর্মপিপাসু ব্যক্তিরা দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় সচেতন হতে আরম্ভ ক'রেছিলেন। অতিথিদের আপ্যায়নের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে মথুরবাবুও ত্রুটি করেন নি।

দ্বিতীয়, এলেন জটাধারী নামে এক রামায়েৎ সম্প্রদায়ের সাধু, সঙ্গে তাঁর 'রামলালা' নামে বালক রামচন্দ্রের একটি ছোট পিতলের বিগ্রহ। এই 'রামলালা' বিগ্রহকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বাৎসল্যভাবের সাধনা করেন। এরপর তাঁর মধুরভাবের সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ হয়। এককথায় বলা যায় তন্ত্র এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত সাধনার সার নিজের জীবনে সংগ্রহ করা সমাপ্ত হল এই পর্বে!

কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। কঠিন থেকে কঠিনতর পথে যাত্রাই শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য; লক্ষ্য শুধু হিন্দুধর্মের নয়, সর্বধর্মের সমন্বয় সুষমামণ্ডিত করা নিজের জীবনে।

তৃতীয়, দক্ষিণেশ্বরে এলেন শ্রীমৎ তোতাপুরী, পরম শক্তিমান বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। এই তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত-সাধনার

দীক্ষা নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ন্যাস নিয়েছিলেন কিন্তু পাছে মায়ের মনে আঘাত লাগে তাই সন্ন্যাসের চিহ্ন, যেমন গেরুয়াবসন ইত্যাদি গ্রহণ করেন নি। বার বার তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি, শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব মাতৃভক্তির কথা। ভুলে যেয়োনা তাঁর বাণী—"যে মা মন্দিরে র'য়েছেন তিনিই এই দেহকে জন্ম দিয়েছেন…।"

অপূর্ব নিষ্ঠা ও অলৌকিক সংযম সম্বল ক'রে বেদান্ত-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন, লাভ হ'ল নির্বিকল্প সমাধি। অর্থাৎ জাগতিক সব বন্ধন মুক্ত হ'য়ে ঈশ্বরে লীন হ'য়ে গেলেন সাধক। শুধু তাই নয়, তোতাপুরীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের মত শিষ্য পাওয়াও ব্যর্থ হ'ল-না। কাহিনীটা একটু খুলেই বলি।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন কঠিন আমাশয়ে কাতর হ'য়ে পড়েন তোতাপুরী। রোগের যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে একদিন তিনি গেলেন গঙ্গায় ডুবে মরতে। কিন্তু মরা আর হ'ল না, মা ভবতারিণী অভয় দিলেন তাঁকে। জগন্মাতার এই কৃপা তাঁর সামনে খুলে দিল এক নূতন জগৎ। বেদান্তবাদী গুরু, শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিভাব ও মাতৃসাধনার স্বরূপ চিনলেন, হয়তো সঙ্গে সঙ্গে জানলেন তাঁর শিষ্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য।

দক্ষিণেশ্বরে এরপর এলেন গোবিন্দ রায় নামে এক সুফী দরবেশ। সুফীরা মুসলমান, কতকটা আমাদের বাউল সম্প্রদায়ের মত। এই গোবিন্দ রায়ের শিষ্যত্ব বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সুফী-সাধনার মূলতত্ত্ব অবগত হ'লেন।

এইসব ঘটনার অনেক, অনেক পরে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ধনী ভক্তের বাগানবাড়ীতে যীশুর একটি ছবি দেখতে দেখতে তিনি সমাধিস্ত হন। ধ্যানের গভীরতায়

খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব তাঁর অন্তরে সেদিন যে প্রতিভাত হ'য়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি !

একজন তামাক খাবে, ত প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হ'য়েছে। তারা ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। অনেকক্ষণ ধ'রে ঠেলাঠেলি করবার পর, একজন দোর খুলতে নেমে এলো। লোকটির সঙ্গে দেখা হ'লে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি গো, কি মনে ক'রে? সে বললে, আর কি মনে ক'রে, তামাকের নেশা আছে, জান তো; টিকে ধরাব মনে ক'রে। তখন সেই লোকটি বললে,—বাঃ, তুমি তো বেশ লোক। এত কষ্ট ক'রে আসা আর দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতে যে লণ্ঠন র'য়েছে।

যা চায়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(১১)

আগের চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার দ্বিতীয় পর্বের সামান্য আভাস দেবার চেষ্টা ক'রেছি। আগেই ব'লেছি যে সাধনা হচ্ছে অন্তরের বস্তু, শুধু প'ড়ে বা শুনে সাধনার রহস্য, আনন্দ, অনুভূতি বা সিদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে যে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পদ্ধতির বিভিন্ন পথ নিজের জীবনে পরীক্ষা করা, তার শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য। অর্থাৎ তাঁর প্রতিজ্ঞা নিজে পরিপূর্ণ না জেনে কিছুই স্বীকার করবেন না। কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার জন্য চাই অসাধারণ নিষ্ঠা, জ্বলন্ত বিশ্বাস। এ দু'টো গুণ তো পূর্ণমাত্রায় ছিলই শ্রীরামকৃষ্ণের। কিন্তু সবার ওপরে সাধনার পথে তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল মা ভবতারিণীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি। মা-ই যেন তাঁর প্রিয় ছেলেকে হাত ধ'রে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সাধনার পথে এক একটি পরম অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

সাধনার শেষে দেহ কিন্তু ভেঙে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের। কঠিন আমাশয়ের আক্রমণে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কামারপুকুরে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন মথুরবাবু, সঙ্গে গেলেন ভৈরবী। সাধনার সাগর মন্থন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ তুলেছিলেন সুধা! সেই সুধা বণ্টন করতে গেলেন বাল্যের লীলাভূমি অতি প্রিয় কামারপুকুরে। গ্রামের সকলে দেখল কিছুই পরিবর্তন হয়নি তাদের পরিচিত গদাধরের, সেই সরল হাসি, স্নেহমধুর কথা, সেই ভালোবাসায় ভরপুর সদানন্দ মানুষটি। কিন্তু কাছে আসতেই বুঝল, হয়েছে বৈ কি পরিবর্তন। মানুষটির কাছে গেলেই মনে

জাগে পবিত্রতা আর অনাবিল শান্তি, ছোঁয়া লাগে তাঁর তন্ময়, উদাস দুটি চোখ থেকে ঠিকরে পড়া পরমানন্দের। একেই বুঝি বলে অমৃতের আস্বাদ।

আগেই বলেছি জয়রামবাটী থেকে মা সারদামণি এইসময়ে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন স্বামীর সেবা করতে। এইসময়েই স্বামীর কাছে তাঁর শুরু হ'য়েছিল জীবনের পরম এবং প্রয়োজনীয় সব শিক্ষা। মন্দিরের মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ নিজের হাতে গড়ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; তাঁর অন্তর জুড়ে অধিষ্ঠান হচ্ছিল পরমা-শক্তির। ভৈরবী বুঝলেন তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, আদ্যাশক্তি এসে ব'সেছেন তাঁর প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে। এই কামারপুকুর থেকেই চিরবিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী।

প্রায় ছয় সাত মাস কামারপুকুরে আনন্দের তরঙ্গ তুলে সুস্থ দেহে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মথুরবাবু ঠিক সেই সময়েই পশ্চিমে তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অনেক অনুরোধের পর শ্রীরামকৃষ্ণ রাজী হ'লেন তীর্থযাত্রীর দলে যোগ দিতে। প্রথম তাঁরা গিয়েছিলেন ৺বৈদ্যনাথধামে। এইখানেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ৺বৈদ্যনাথধামের কাছেই একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে ছিলেন মথুরবাবু। গ্রাম-বাসীদের দারিদ্র্য দেখে বিচলিত হ'ল সেই দয়ালের প্রাণ। তিনি তখুনি মথুরবাবুকে আদেশ দিলেন প্রত্যেক গ্রামবাসীকে এক-বেলার ভুরি ভোজ আর একখানা ক'রে কাপড় দেবার জন্য। বিষয়ী মথুরবাবু প্রথমে অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে রাজী হননি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আদেশে অটল। হয় তাঁর কথামতো কাজ হবে আর নয়তো তিনি সটান ফিরে যাবেন দক্ষিণেশ্বরে। শেষ পর্যন্ত মথুরবাবু আদেশানুযায়ী ব্যবস্থা করতে বাধ্য হ'লেন।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই বলেছেন—ঈশ্বরের কাজের মর্ম বোঝা মানুষের সাধ্য নয়। তিনিই আবার দরিদ্রের দুঃখ দূর করার জন্য এমনভাবে ব্যাকুল হ'লেন—ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত আর রহস্যময় মনে হয় না? কিন্তু সত্যিই কিছু অদ্ভুত বা রহস্যময় নেই এর মধ্যে। পরে আমরা দেখছি ঠাকুরের শিষ্যরাই গ'ড়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, নিয়েছেন সেবার ব্রত। নরনারায়ণের যে পূজা শুরু হবে ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ অবলম্বন ক'রে, তারই বোধহয় সূত্রপাত ৺বৈদ্যনাথধামের এক গণ্ডগ্রামে। তা ছাড়া হয়তো এই সুযোগে মথুরবাবুর মনে সেবাধর্মের বীজ উপ্ত করাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

৺বৈদ্যনাথধামের পর যাওয়া হ'ল বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন। ৺কাশীধামে পেঁাছেই আনন্দ-সাগরে ডুবে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শিবপুরী কাশী, হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। বালকের মত প্রফুল্লচিত্তে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। তখন কাশীতে ছিলেন ভারতের আর এক মহাপুরুষ—তৈলঙ্গ স্বামী। তাঁকে লোকে বলতো জীবন্ত শিব। তৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শুধু দেখাই হয় নি, একে অপরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্টও হয়েছিলেন।

৺বৃন্দাবনেও সেই একই কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই ব্রজধামে। এক একটি স্মৃতির সামনে দাঁড়ান, আর অপূর্ব ভাবে বিভোর হ'য়ে ওঠে তাঁর অন্তর। যেন ব্রজলীলা তিনি দেখতে পান চোখের সামনে। এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হয় গঙ্গামায়ী নাম্নী এক ভক্তিমতী বৃদ্ধার সঙ্গে। বৃদ্ধার স্নেহে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন বালক-হৃদয় সাধক। মথুরবাবুর মনে হ'ল বৃন্দাবন ছেড়ে আর বোধহয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না তাঁর

গুরুকে। শেষে ভাববিভোর সন্তানকে বলা হ'ল বৃদ্ধা জননীর কথা, যিনি দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানায় ব'সে চেয়ে আছেন ছেলের ফেরার পথ। মন্ত্রের মত কাজ করল এই কথা। তখুনি ফিরতে রাজী হ'লেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে ব্রজধামের ধূলি পঞ্চবটীতলায় ছড়িয়ে দিয়ে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ "আজ থেকে এ' স্থান বৃন্দাবনে পরিণত হ'ল।" পরবর্তী সব ঘটনা শোনার পর এবং আজ দক্ষিণেশ্বর এক তীর্থ-ভূমিতে পরিণত হওয়া দেখে এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার কোনও সন্দেহ থাকবে না।

এ পর্যন্ত আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত ও সাধক জীবনের বিবরণ দিয়েছি। এরপর তিনি অবতীর্ণ হবেন যুগপ্রবর্তকের ভূমিকায়, সর্বজনমান্য লোকশিক্ষক রূপে। আগেই বলেছি জাতির এক সঙ্কটময় মুহূর্তে, ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রয়োজন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের। সেই প্রয়োজন পূর্ণ হবার ঠিক পূর্বক্ষণে দক্ষিণেশ্বর রূপান্তরিত হ'ল ব্রজধামে। কিন্তু সেই কাহিনীতে যাবার আগে এই সময়কার আরও দু'চারটে বিশেষ ঘটনা তোমার জানা প্রয়োজন।

প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ পেলেন আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা। তাঁর পরম স্নেহের ভাইপো রামকুমারের ছেলে অক্ষয়ের মৃত্যু হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরেই ছিল অক্ষয়। হঠাৎ ক'দিনের জ্বরে তার মৃত্যু হ'ল। মৃত্যু যে ঈশ্বরগতপ্রাণ সাধককেও বিচলিত করবার শক্তি রাখে, অক্ষয়ের মৃত্যু উল্লেখ ক'রে বার বার তা ব'লেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেছেন, "ঐখানে (মন্দির-সংলগ্ন বারান্দায়) দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি—যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নেংড়ায়—অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্ছে।···এখানেই (আমার) যখন এ'রকম হ'চ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!"

কি সরল স্বীকারোক্তি ! গৃহীদের দুঃখে করুণাঘন মহাপুরুষের কি দরদ, কি গভীর সহানুভূতি !

এই শোকাবহ ঘটনার পর মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের জমিদারীতে বেড়াতে নিয়ে যান। ফেরবার পথে ৺নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যের লীলাপুত মন্দির ইত্যাদি দর্শন ক'রেন দু'জনে। এর কিছুদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয় ও মথুরবাবুর সঙ্গে কালনায় গিয়ে খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাধু ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এইখানে একটা কথা ব'লে রাখি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন— "যেখানেই শক্তি সেখানেই ঈশ্বরের বিশেষ বিকাশ।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথাবার্তার সময় ব'লেছিলেন "বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। তিনি কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হ'লে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন ?...তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে।" শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দেখতে যেতেন। খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম শুনলেই, তা তিনি বিখ্যাত সাধু, পণ্ডিত গায়ক, লেখক বা অভিনেতা হোন না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল হ'তেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। এইসব ব্যক্তির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আরাধ্যা শক্তির স্ফুরণ দেখতে চাইতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু ব্যাকুলই হননি, স্বয়ং এগিয়ে গেছেন এইসব ব্যক্তির কাছে আলাপের তীব্র আকুলতা নিয়ে। এই বৈশিষ্ট্যটুকু মনে রাখলে জাতির জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তী ভূমিকা সহজেই বুঝতে পারবে।

এই সময়কার শেষ আঘাত এলো মথুরবাবুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে এসে গ্রাম্য বালক গদাধর ধীরে

ধীরে কঠিন সাধনার মধ্য দিয়ে ফুলের মত ফুটে উঠেছিল যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। এই ফুলটির বিকাশে যিনি সর্বস্ব দিয়ে প্রায় একযুগ ধ'রে সাহায্য ক'রেছিলেন সেই মথুরবাবু ছেড়ে চ'লে গেলেন তাঁর গুরুকে। বৃহত্তর এক বিধিনির্দিষ্ট কর্মযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিলেন নিষ্কাম ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ; তাই হয়তো এই বিচ্ছেদের প্রয়োজন ছিল।

ভাল ত বাসবে,—সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বোলে। কিন্তু যেখানে দুষ্ট লোক সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে।

সব তো নারায়ণ··· হাতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও নারায়ণ। মাহুত যে কালে ব'লছে, হাতীর কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের কথা না শুনি কেন?

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(১২)

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে নূতন পর্বের সূচনায় আমার পূর্ববর্তী বক্তব্যের সারমর্ম অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের গোটাকতক বৈশিষ্ট্যের কথা আবার মনে ক'রিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। বালক গদাধরের জীবনে আমরা দেখেছি-পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে, সরল অনাড়ম্বর পল্লীবাসীদের সঙ্গে তার ছিল আত্মার আত্মীয়তা। অর্থাৎ আমাদের এই দেশের শান্ত, সরল, সুন্দর চিরন্তন জীবনধারার সঙ্গে নিবিড় মমত্বের বন্ধনে বাঁধা প'ড়েছিল বালক গদাধর। তারপর দক্ষিণেশ্বরের জীবন। এখানেও প্রাচীন ভারতের সাধনাকে, একাধিক শাস্ত্রীয় প্রণালীকে অসীম যত্ন ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে নিজের জীবনে পরীক্ষা ক'রেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং জেনেছিলেন পরম সত্যকে। এরই সঙ্গে সঙ্গে এলেন কত সাধুসন্ত, কত পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁদের কাছ থেকে তিল তিল ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করলেন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে আহরিত মধু, ভারতের সনাতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহুমুখী ধারা থেকে অঞ্জলি ভ'রে তুলে নেওয়া অমৃত। কিন্তু কেন, কিসের জন্য, কাদের জন্য এই সঞ্চয়? তবে কি শুধু পুরাতন আর প্রচলিতকে নিয়ে এইবার সন্তুষ্ট জীবন যাপন করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ?

এই প্রশ্নেরই উত্তর আছে পরবর্তী ঘটনায়। নব্যবঙ্গের ইতিহাসে নূতনের সূচনার, ভবিষ্যতের পথে অমৃতের স্পর্শ রাখার জন্যই জাতির জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

প্রশ্ন হ'তে পারে তবে কি এতদিন কৌতূহলী লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? মথুরবাবু এবং মন্দিরের ব্যাপারে

জড়িত জনকয়েক ছাড়া আর কেউ কি উপলব্ধি করেননি এই মহাপুরুষের মহিমা? ভৈরবী যোগেশ্বরী, সাধু তোতাপুরী ইত্যাদির কথা আগেই ব'লেছি। নূতন পর্বের পূর্বে এ ছাড়াও অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মপিপাসু ব্যক্তি এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে। দেশবরেণ্য পণ্ডিত বৈষ্ণচরণ ও গৌরীকান্ত এসেছিলেন ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন। তারপর আসেন পণ্ডিত এবং বৈরাগ্যবান পুরুষ নারায়ণ শাস্ত্রী, বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ, ভক্তিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের সরল, মধুর স্বভাবে এঁদের প্রত্যেকেই মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, প্রত্যেকেই আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন তাঁর নিষ্ঠা ও ভক্তিতে এবং প্রত্যেকেই তাঁর সংস্পর্শে এসে জীবনে নূতন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন। তুমি 'কথামৃত' পড়তে পড়তে এইসব মহদাশয় ব্যক্তির পরিচয় পাবে, তাই নামটুকু এখানে জানিয়ে রাখলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই তৃতীয় পর্বের সূচনা ১২৮২ সালে এবং শেষ ১২৯৩ সালে, তাঁর তিরোধানের সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বারো বৎসর আমরা পাই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে। মনে রাখতে হবে যে এই সময়ের মধ্যে কোন ধর্মপ্রচার তিনি করেননি বা অগনিত শিষ্য ও শিষ্যা সৃষ্টি ক'রে রেখে যাননি কোন বিশেষ মতবাদ। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে আমরা তো এইটাই দেখি। ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার করছেন কোনও ধর্ম-প্রচারক, প্রয়োজন হ'লে তর্কবিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করছেন নিজের মতবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এর ব্যতিক্রম। কথা তাঁর একটাই "ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য"। এই বানী নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ব'সে তিনি আকর্ষণ ক'রেছিলেন তাঁর প্রয়োজনীয় ভক্তদের। তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনতে দক্ষিণেশ্বরে লোক যে যায়নি

তা নয়। শত শত লোক বারো বছর ধ'রে শুনেছে তাঁর কথামৃত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই তৃতীয় পর্বকে এক কথায় বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয়—দিব্য জীবন এবং কথামৃতের প্রভাবে তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন মানুষের সুপ্ত চেতনা, চেয়েছিলেন সারা দেশে এক নবজাগরণের সাড়া তুলতে। তাঁর সাধনার জ্যোতি সেদিনও যেমন ছিল, আজো তেমনি ভাস্বর আছে, ভবিষ্যতে আরও হবে।

ইতিহাসের প্রয়োজনেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। সেই ইতিহাস মুখর হ'ল নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমে।

কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তখনকার ব্রাহ্মসমাজের এবং তরুণদের নেতা। ১৮৬৪ সালে এই কেশবচন্দ্রকে প্রথম দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আগেই ব'লেছি যেখানেই ধর্মের কথা সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা দেখতে গিয়ে দেখেছিলেন কেশবচন্দ্রের ধ্যানস্তব্ধ মূর্তি। কেশবচন্দ্র কিন্তু তখন চিনতেনও না শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-আকর্ষণীতে কেশবচন্দ্র ধরা পড়েন এই ঘটনার দশ বৎসর পরে। সেইবারও বেলঘরিয়ার বাগানবাড়ীতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নিজেই দেখা করতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গান গাইলেন, গল্প শোনালেন কেশব আর তাঁর দলবলকে।

গল্প দিয়ে সেদিন ঈশ্বরের বহুরূপীত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা নির্ণয় করা মানুষের অসাধ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—এ যেন অন্ধের হাতী দর্শনের মত। গল্পটা শোন :—কতকগুলো কাণা একটা হাতীর কাছে এসে প'ড়েছিল। একজন লোক ব'লে দিলে এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা

স্পর্শ করতে লাগল। একজন ব'লে হাতী একটা থামের মত! সে কাণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বল্লে—হাতীটা একটা কুলোর মত! সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানা প্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে ক'রেছে ঈশ্বর এমনি; আর কিছু নয়।

আসবার সময় বললেন কেশবকে "তোমার লেজ খ'সেছে।" সকলেই হেসে উঠল কথাটা শুনে, কেশব কিন্তু জানতে চাইলেন তার গূঢ় অর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন "যতদিন ব্যাঙাচির লেজ না খসে, তার কেবল জলে থাকতে হয়—আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না; যেই লেজ খসে অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে আবার ডাঙায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার (শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঈশ্বরকে জানাই একমাত্র বিদ্যা আর বাকী সব কিছু অবিদ্যা) লেজ না খসে, ততদিন সংসার-জলে প'ড়ে থাকে। অবিদ্যার লেজ খসলে, জ্ঞান হ'লে—তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে—আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারে থাকতে পারে।"

এই ঘটনার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে একান্ত হ'য়ে জড়িয়ে গেলেন কেশবচন্দ্র। আর এই ঘটনার পরই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজে প্রথম ঘোষণা করলেন কেশবচন্দ্র "সম্প্রতি একজন সত্যিকার হিন্দু সাধকের (দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের) সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয় ঘটিয়াছে। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতায়, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে ও সরলতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। অনর্গলভাবে যে সকল সহজ উপমা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়-সমূহ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেগুলি যেমন উপযোগী, তেমনি

হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার মনের গঠন দয়ানন্দ সরস্বতী (তৎকালীন এক বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক) মহাশয়ের ঠিক বিপরীত। দয়ানন্দ তর্ক ভালবাসেন, মল্লযোদ্ধার ন্যায় প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য তিনি সতত তৎপর। পরমহংসদেবের মধ্যে এসব কিছুই নাই ; তিনি অতি শান্ত, ধীর, তাঁর ভাব গভীর, কথাবার্তা ও ব্যবহার অতি মধুর।"

কেশবচন্দ্র ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্ম। তবুও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রগাঢ় আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন। এই আত্মীয়তার ইতিহাস নিয়েই একটা আলাদা বই লেখা যায়। প্রায় ন' বছর চলেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের সুমধুর লীলা। আমি এখানে শুধু কেশবচন্দ্রের দু' চারটে কথা দিয়ে তোমায় জানাতে চাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল এই দিক্‌পাল যুগপুরুষের।

কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব'লেছেন "দেখ ! পরমহংস মহাশয় লাটের মাল নহেন ; তিনি অমূল্য বস্তু, গ্লাসকেসে রাখিবার উপযুক্ত।" আবার এক জায়গার ভক্তদের ব'লেছেন "পরমহংস মহাশয়কে সাধারণের সঙ্গে সংকীর্তন করাতে নেই। উৎকৃষ্ট ফুল যেমন সাধারণভাবে ব্যবহার করলে শীঘ্রই তার সৌন্দর্য নষ্ট হ'য়ে যায়, তেমনি ওঁকেও ফুলের মত জানবে ; দূর থেকে সকলে তাঁর সৌন্দর্য উপভোগ করবে, সকলে তাঁর উপদেশ শুনবে।"

এমন কথা বলেছেন তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা, তরুণদলের মুখপাত্র, পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মণীষী কেশবচন্দ্র সেন।

আর শ্রীরামকৃষ্ণ ? ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করেন কেশবচন্দ্র। সেই সংবাদ সম্বন্ধে তিনি নিজেই ব'লেছেন

শিষ্যদের "খবর শুনে তিন দিন শয্যা গ্রহণ করতে পারিনি; মনে হ'য়েছিল যেন আমার একটা অঙ্গ খ'সে গিয়েছে!"

এর পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের কতখানি আপনার ছিলেন কেশবচন্দ্র তা কি ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আছে?

একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত প'ড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছলো। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল। আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব!

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(১৩)

কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে দু'চার কথা আগের চিঠিতে ব'লেছি। এ বিষয়ে বলবার অনেক কিছু আছে মোট কথা হচ্ছে তখনকার সমাজ ও সংস্কৃতি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হ'য়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের তখন গৌরবের দিন। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ আকর্ষণ করলেন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যমণি কেশবচন্দ্রকে। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য অনেক ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় ছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আগেই পরিচয় হ'য়েছিল তাঁর। তবুও কাছে টানলেন তিনি কেশবচন্দ্রকে। কেন ?

মনে রাখতে হবে যে কেশবচন্দ্র শুধু ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন তা নয়, তখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের তিনি ছিলেন চোখের মণি। আর শ্রীরামকৃষ্ণের তো প্রয়োজন ছিল এই তরুণদেরই, প্রয়োজন ছিল পাশ্চাত্যের মোহ থেকে মুক্ত করে প্রাচ্যের মহিমার সঙ্গে এদের পরিচয় করানো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আর কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বললে এইসব তরুণের দল, এই শিক্ষিতের সমাজ হয়তো শুনতোই না। কিন্তু কেশবচন্দ্র যখন ব'লেছেন তখন দেখতে হবে বৈ কি কেমন মহাপুরুষ এই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস।

দেখবার জন্যে দলে দলে লোক আসতে লাগল দক্ষিণেশ্বরে। এই যাত্রীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একদল আসতো হুজুক বা কৌতূহলের বশে। দ্বিতীয় দলে থাকতো মহাপুরুষের কৃপায় কিছু বৈষয়িক উন্নতি বা কোন রোগমুক্তি লাভের আশা। আর

তৃতীয় দলে থাকতো ব্রাহ্মসমাজের এবং বাইরের শিক্ষিতেরা, যাঁরা চাইতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে যাচাই করতে। কোনও সন্দেহ নেই যে এইসব যাত্রীদের সংস্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি তো এঁদের চাননি। তিনি পথ চেয়ে ছিলেন তাদের যারা আজন্ম শুদ্ধ-অন্তর নিয়ে আসবে, যারা সত্যিকারের চাইবে ঈশ্বরের কৃপা, যারা শিক্ষিত ব'লেই হবে সাধনার কঠিন শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম। এদেরই জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'সেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এদের কথা বলতে গিয়েই ব'লেছেন "তোদের সব দেখবার জন্যে প্রাণের ভিতরটা তখন এমন ক'রে উঠত···ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হত।··· বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত—তখন আরও একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলিনি ব'লে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির উপর ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস রে'—ব'লে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাক ছেড়ে কাঁদতুম···তার পর কিছুদিন বাদে তোরা সব আসতে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই।"

'চিহ্নিত' ভক্তদের আসা সত্যিই আরম্ভ হ'য়েছিল। প্রথম এলেন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত আর তাঁর মাসতুতো ভাই মনোমোহন মিত্র। অনেক সন্দেহ আর একাধিক প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন এই দুই শিক্ষিত তরুণ। মনোমোহনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি প্রথম দিন তাঁরা তিনটি প্রশ্ন ক'রেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। প্রথম প্রশ্ন, ঈশ্বর আছেন কিনা? দ্বিতীয়, যদি থাকেন তবে তাঁকে পাওয়া যায় কি না? তৃতীয়, যদি পাওয়া যায় তবে এ জন্মেই তা সম্ভব কি না? এই দুই গোঁড়া নাস্তিককে বোঝাবার জন্যে অনেকগুলো সুন্দর উপমা দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাদের মধ্যে একটা তোমায় শোনাচ্ছি:

"কোন পুকুরে মাছ ধরতে ইচ্ছে হ'লে আগে যারা মাছ ধ'রেছে তাদের কাছে জেনে নিতে হয় সেই পুকুরে কেমন মাছ আছে, কিসের টোপ খায়, কিরূপ চারের প্রয়োজন ইত্যাদি। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ জানবে। যেমন ছিপ ফেলবামাত্র মাছ ধরা যায় না, স্থিরভাবে চুপ্ ক'রে ব'সে থাকতে হয়,—কিছুক্ষণ পরে মাছের ঘাই ও ফুট দেখতে পাওয়া যায়। তখন ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় যে পুকুরে মাছ আছে। আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধ'রে থাকলে পর মাছ গেঁথে তুলতে পারা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই প্রকার জানবে। সাধুর কথায় বিশ্বাস ক'রে মন ছিপে, প্রাণ কাঁটায়, নাম টোপে, ভক্তি চার ফেলে অপেক্ষা করতে হয়; তবেই ঈশ্বরের ভাবরূপ ঘাই ও ফুট দেখতে পাওয়া যাবে। পরে একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে।"

কি সুন্দর উপমা! কি অপূর্ব আশার বাণী! এই সময় থেকেই মধুর সব কাহিনী আর সুন্দর উপমা দিয়ে উপদেশ বিতরণের শুরু। প্রত্যেকটি কাহিনীর ভেতর আছে তোমার, আমার, সকলের পরিচিত জগতের বিষয় ও বস্তু, প্রত্যেকটি উপমার মধ্যে আছে একটি কবি মনের পরিচয়। 'কথামৃতে'র পাঁচ খণ্ড ভ'রে আছে এই কাহিনী আর উপমার সম্পদে। ভক্তির কথা, সাধনার গূঢ় তত্ত্ব সব বাদ দিলেও, 'কথামৃত' এক অপূর্ব সাহিত্য।

এরপর যাঁর নাম মনে পড়ছে তিনি হ'লেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। সুরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন মুখে বুলি নিয়ে "……বুজরুকী অনেক দেখেছি। তোমাদের পরমহংস দেখতে গিয়ে যদি ভণ্ড দেখতে পাই, তবে আমি কিন্তু কান মলে দেবো।" কান মলতে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের জালে ধরা পড়লেন সুরেন মিত্তির; শ্রীরামকৃষ্ণ ডাকতেন "সুরেশ মিত্তির" ব'লে।

এই তিনজনেই সহরের শিক্ষিত সমাজে নানা উপায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ প্রচারে প্রথম উদ্যোগী হন। বক্তৃতা, আলোচনা, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি উপায়ের সাহায্যে তাঁদের নবলব্ধ উপলব্ধিকে জনসমাজে প্রচারের চেষ্টা ক'রেছিলেন রামচন্দ্র ও মনোমোহন। রামচন্দ্র "তত্ত্বসার" ও "তত্ত্বপ্রকাশিকা" নামে দু'খানা বই প্রকাশ ক'রেছিলেন। বই দু'খানায় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য সব উপদেশ।

এইখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সম্বন্ধে দু'একটা কথা ব'লে রাখি। দেশ-বিদেশের বহু মনীষী এবং শিক্ষিত ব্যক্তি মুগ্ধ হ'য়েছেন এই কথামৃতের আস্বাদ পেয়ে। মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা ব'লেছেন একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। মন্ত্রের মতই এই সব উক্তি সত্য এবং শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং পরম নাস্তিকও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'তে বাধ্য। আর নিরক্ষর সাধারণ মানুষ মুগ্ধ এই কথামৃতের মধুর রসে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলার একটি নিজস্ব ভঙ্গী ছিল। বড় চমৎকার সেই ভঙ্গী। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তিনি কথা বলতেন, উপমা আর গল্পের সাহায্যে অত্যন্ত কঠিন বিষয়কেও সকলে যাতে বুঝতে পারে এমন ক'রে পারতেন ব্যাখ্যা করতে। এই সূত্রে তোমার আর দুই মহাপুরুষের কথা জানা দরকার। গৌতম বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার ক'রেছিলেন 'পালি' ভাষায়। পল্লীর জনগণের কথা বলার ভাষায় প্রচারিত ব'লেই নাম হ'য়েছে 'পালি'। যীশুখৃষ্টের উপদেশের ভাষাও ছিল অত্যন্ত সহজ কিন্তু প্রতিটি কথাই সত্যের অগ্নিদীপ্তিতে, উপলব্ধির মহিমায় ভাস্বর। বাইবেল যখন পড়বে তখন সেই অপূর্ব গ্রন্থের সঙ্গে 'কথামৃতের' মিল খুঁজে পেতে তোমার কষ্ট হবেনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর ছোট্ট একটা নমুনা দিয়ে এই চিঠি শেষ

করি। হরিসভায় এক পণ্ডিত ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নানা গোলমেলে কথা বলছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনলেন, তারপর শুরু করলেন তাঁর কথামৃত : "একজন ব'লেছিল তার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। এ' কথায় বুঝতে হবে ঘোড়া আদবে নেই ; কেন না, গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।' একটি ছোট্ট উপমার আঘাতে ভেঙ্গে দিলেন পাণ্ডিত্যের ভুল কচ্‌কচি।

চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা হচ্ছে তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর, একজনের দাঁতে ব্যামো আছে, কন্‌কন্ করে। সব কর্ম করছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে। তা হ'লে ধ্যান চোখ চেয়েও হয়, কথা কইতে কইতেও হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(১৪)

আগের চিঠিতে কেশবচন্দ্রের প্রচারের প্রভাবে সহরের শিক্ষিত সমাজে আলোড়নের কথা ব'লেছি। দলে দলে লোক আসছিল দক্ষিণেশ্বরে ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এইসব বিষয়াসক্ত বা হুজুকপ্রিয় মানুষদের জন্য কুটিরের ছাদে উঠে আকুল হ'য়ে জানাননি তাঁর আহ্বান। ইতিহাসের যে তপস্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সেই তপস্যাকে সার্থক করার প্রয়োজনে তিনি কাছে চাইছিলেন একদল সর্বত্যাগী আজন্মশুদ্ধ ভক্তকে, যারা রূপ দেবে তাঁর সাধনায় প্রাপ্ত সত্যকে, যারা দেশে বিদেশে প্রচার করবে তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী।

দক্ষিণেশ্বরে রামচন্দ্র, মনোমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের পদার্পণের মধ্যেই এই মহৎ ভবিতব্যের সূচনা। তাই এঁদের কথা আগের চিঠিতে ব'লেছি। এঁরাই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান শিষ্য রাখাল এবং শ্রেষ্ঠ শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। নূতন এক যুগের এইখানেই অরুণোদয়। এইসব চিহ্নিত সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইবার দিচ্ছি।

লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ঃ—বিহারের এক গ্রাম থেকে সহরে এসেছিল বালক 'লাটু।' কাজ খুঁজতে খুঁজতে ভৃত্যের কাজ পেল রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে। খায় দায় থাকে। হঠাৎ একদিন কৌতূহল হ'ল যাঁর কথা তার প্রভু দিনরাত বলছেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার। হেঁটে চ'লে গেল দক্ষিণেশ্বর, সেখানে শুধু সে দেখলনা, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সঁপে দিল সেই মহাপুরুষের পদতলে। এই হচ্ছে শুরুর কথা। শেষে আমরা

দেখেছি নিরক্ষর বিহারী বালক হয়েছে সন্ন্যাসী "স্বামী অদ্ভুতানন্দ"। চেষ্টা ক'রেও 'লাটু'কে বাংলা শেখাতে পারেন নি শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। ঈশ্বরলাভের জন্য যা প্রয়োজন সেই অসীম নিষ্ঠা, কঠিন সংযম, জ্বলন্ত বিশ্বাস আর প্রগাঢ় ভক্তি থাকলেই হ'ল।

ঈশ্বরভক্তির অপূর্ব ফল দেখাবার জন্যই বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি নরম মাটির তাল-কে রূপান্তরিত ক'রেছিলেন সর্বাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণ মানুষে। বিবেকানন্দ তাই বলতেন "তোমরা যদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইতে চাও, তবে লাটুর দিকে তাকাও ; এমন কাণ্ড আমি কখনও দেখি নাই।"

রাখালচন্দ্র (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)ঃ—১৮৮০ খৃঃ যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন বসিরহাটের এক জমিদারের আদরের দুলাল, নাম ছিল তাঁর রাখালচন্দ্র ঘোষ। ভক্তি, বিশ্বাস ও ধ্যানপরায়ণতার গুণে পরে আমরা এঁকেই দেখি স্বামী ব্রহ্মানন্দ-রূপে। অল্পবয়সেই বিবাহ করেন রাখাল এবং সেই সূত্রে মনোমোহনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা হয়। তারপর মনোমোহনের হাত ধ'রে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখাল ছিলেন পুত্রসম। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা হবার পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষরূপে বরণ করেন।

গোপাল সুর (স্বামী অদ্বৈতানন্দ)ঃ— শ্রীরামকৃষ্ণ আদর ক'রে ডাকতেন "বুড়ো গোপাল" ব'লে। সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় ছিলেন গোপাল। প্রথম জীবন কাটে দক্ষিণেশ্বরের কাছে সিঁথিতে, ফলাও কাগজের কারবার আর জমজমাট সংসার নিয়ে। তাই কাছে হ'লেও যাওয়া হয়নি দক্ষিণেশ্বরে। শুনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের নাম আর হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর হঠাৎ

স্ত্রীর মৃত্যু হ'ল। শোকের আঘাতে ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরে, সান্ত্বনার আশায়। সেখানে শুধু সান্ত্বনাই পেলেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয়ও মিলল। এঁকেই পরে দেখি সন্ন্যাসী ভক্ত স্বামী অদ্বৈতানন্দরূপে, দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের রোগশয্যায় সেবা করছেন অপরিসীম দক্ষতা আর অসীম নিষ্ঠা নিয়ে।

তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ) ঃ—তারকনাথ ঘোষালের জন্ম হয় বারাসতের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তারকের পিতা ছিলেন পরম ভক্ত, কালীর উপাসক। পিতার সাধনা পুত্রের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই স্বামী শিবানন্দের জীবন। বিবাহিত তারকনাথ চাকরী করছিলেন, প্রথমে দিল্লীতে, পরে ক'লকাতায়। মনে অসংখ্য প্রশ্ন, অন্তরে যোগসাধনার অপার আকুলতা। কিন্তু মনের মত গুরু কোথায়? রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে দেখা পেলেন গুরুর। গেলেন দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীরামকৃষ্ণও চিনে নিলেন তাঁর চিহ্নিত ভক্তকে। ইতিমধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু হ'য়েছিল। সন্ন্যাস নেবার পূর্বক্ষণে পুত্র চাইলেন পিতার অনুমতি। পিতা শুধু অনুমতিই দিলেন না, পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন "ভগবান করুন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।···আমি যেখানে অকৃতকার্য হয়েছি, তুমি সেখানে কৃতকার্য হও—সাক্ষাৎভাবে তুমি পরমেশ্বরের দর্শনলাভ কর।" সাধনার পথে পুত্রকে হাসিমুখে এগিয়ে দেওয়ার এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) ঃ—বিধাতাই যেন বাবুরাম ঘোষের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। বাবুরামের পিতামাতা ছিলেন পরম ধার্মিক। পরে ঘোষ পরিবারের জামাই হ'য়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত বলরাম বসু। স্কুলে পড়তে গেলেন বাবুরাম, সেখানে প্রধান শিক্ষক হিসাবে পেলেন "কথামৃত"

প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে। ভক্তির প্রদীপ বাবুরামের হৃদয়ে তো জ্বলছিলই। এই অনুকূল পরিবেশে তা সহজেই দীপ্ত হ'ল। ধীরে ধীরে বাবুরামকে কাছে টেনে নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়ের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হ'ল স্বামী প্রেমানন্দ।

এইখানে একটা কথা ব'লে রাখি। আমার কি মনে হয় জান, মনে হয় তারকনাথ আর বাবুরাম এই দু'জনের সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারের দু'টি দিক আমাদের চোখের সামনে তুলে ধ'রেছেন; চেয়েছেন প্রতিষ্ঠা করতে দু'টি জ্বলন্ত আদর্শ। একজনকে পিতা হাসিমুখে এগিয়ে দিলেন সর্বত্যাগের পথে, আর অপরজনকে মা স্বেচ্ছায় অনুমতি দিলেন সংসার ত্যাগের সুকঠিন ব্রত গ্রহণে।

প্রেমানন্দ স্বামী সত্যিই ছিলেন প্রেমের অফুরন্ত নির্ঝর। কিন্তু সেই প্রেমানন্দ স্বামীই বলেছেন "কতটুকুই বা আমার ভালবাসা? ঠাকুরের নিকট আমরা যে ভালবাসা পেয়েছি তার তুলনায় এ অতি অকিঞ্চিৎকর।" তা হ'লে কী গভীর প্রেমের উৎস ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে! কী অপার ভালবাসা দিয়ে তিনি কাছে টেনেছিলেন এবং মনের মত ক'রে গ'ড়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের!

নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) ঃ—নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ মামার বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করছিলেন। হঠাৎ এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে। প্রথম দু'তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' শোনার পর তাঁর অন্তর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল বৈরাগ্যের রঙ। কিন্তু তবু সাড়া দিতে হ'ল সংসারের ডাকে, চাকরী নিলেন নিরঞ্জন। খবরটা কানে যেতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন "বল কি? সে ম'রে গিয়েছে

শুনলেও আমার প্রাণে এত কষ্ট হ'ত না।" কিছুদিন পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন নিরঞ্জন। তাঁর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ "ও তাই বল্। তা হ'লে কোন অন্যায় করিস্ নি। মায়ের জন্য চাকরী করতে দোষ নেই।..."

মায়ের মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন নিরঞ্জন।

যোগীন্দ্রনাথ (স্বামী যোগানন্দ) ঃ—দক্ষিণেশ্বরের কাছেই ছিল চৌধুরীদের বাড়ী। চৌধুরীদের ধনসমৃদ্ধির অভাব ছিল না। এই ধনী বংশের ছেলে যোগীন্দ্রনাথ। তাঁর শৈশবেই চৌধুরী পরিবারে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয় এবং এই অবস্থায় কেন কে জানে যোগীনের মনে জাগে ধর্মের প্রতি এক গভীর আকর্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ চৌধুরী পরিবারের পরিচিত ছিলেন। যোগীনের গুরুজনরা তাঁকে বলত "পাগলা বামুন।" দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে যোগীন শুনল এই "পাগলা বামুনের" কথা। তার মন বলল--যিনি এমন সহজ, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ঈশ্বর সম্বন্ধে বলতে পারেন,—তিনি কখনই পাগল নন, নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ।

পরে মায়ের অনুরোধে বিয়ে ক'রেছিল যোগীন। ফলে অনেক দিন লজ্জায় যেতে পারেন নি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণই ডেকে নিলেন তাঁর ভক্তকে, দিলেন সন্ন্যাস।

হরিনাথ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ঃ—বাগবাজারে দাদার কাছে থাকতেন হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। পূজার্চনা এবং শাস্ত্রপাঠের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল তরুণ হরিনাথের। দাদা ভায়ের এইসব ব্যাপারে বাধা দিতেন না। বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়িতে

হরিনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় শ্রীরামকৃষ্ণের। হরিনাথ তখন জ্ঞানের পথ ধ'রেছেন, করছেন বেদান্তের চর্চা। এই অবস্থাতেই আবার একদিন দেখা হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভেঙ্গে দিলেন ভুল, কোলে টেনে নিলেন ভক্তকে।

এ ছাড়াও আর যে সব চিহ্নিত ভক্তকে সন্ন্যাসব্রত দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁদের নাম হচ্ছে—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ) শশী চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), গঙ্গাধর ঘটক (স্বামী অখণ্ডানন্দ), হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ), কালীপ্রসন্ন চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), সুবোধচন্দ্র ঘোষ (স্বামী সুবোধানন্দ) ও সারদাপ্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)।

আজগের চিঠিতে সন্ন্যাসব্রতী মহাজনদের সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারছি না। পরে জানাবো। তবে ভুলে যেওনা যে শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের চিহ্নিত ক'রেছিলেন তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার, জন্য, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিরাট শক্তিধর পুরুষ। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা দিক্ আলোকিত হ'য়ে আছে এঁদের সাধনার জ্যোতিতে। বড় হ'য়ে তুমি এঁদের প্রত্যেকের জীবনী পড়বার সুযোগ পাবে। তখন দেখবে কি কঠিন ক্লেশ, বিপুল ত্যাগ আর অসীম ধৈর্যের মধ্য দিয়ে এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার ক'রেছিলেন দেশ-দেশান্তরে, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে রূপায়িত ক'রেছিলেন দরিদ্রনারায়ণের সেবাকর্মে। এই ক'টি সর্বত্যাগী পুরুষের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার ফল বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর আর্ত, অসহায় মানুষদের মধ্যে। তাঁর সে ইচ্ছা বিফল হবার নয়, হয়নি। দিনে দিনে ব্যাপ্ত হবে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এই ক্ষুদ্র সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর নেতারূপে নির্ধারিত করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে।

নরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কথা পরের চিঠিতে জানাবো।

ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি।.... চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকা চাই।

মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন, করলে কি হবে? খাটতে হয় তবে মাখন ওঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বল্লে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? সাধন চাই।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(১৫)

এখন আমরা ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণে এসে পড়েছি। দেখতে পেয়েছো যে দলে দলে লোক আসছিল দক্ষিণেশ্বরে। অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে সেখানে ব'সেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যার যেমন ভাব সে তেমনি সম্পদ সংগ্রহ ক'রে ফিরে যাচ্ছিল ঘরে। আসছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাঞ্ছিত ভক্তেরা। তাঁদের কেউ কেউ আর ঘরে ফিরে যায়নি; নিয়েছিলেন সন্ন্যাসব্রত। এঁদের কথা কিছু কিছু ব'লেছি। ইতিহাস উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল এই ক্ষুদ্র সন্ন্যাসীদলের নেতার আবির্ভাবের প্রত্যাশায়। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন পথ, কবে আসবেন তাঁর সেই প্রত্যাশিত সর্বগুণের আকর, যোগীবর বিবেকানন্দ। আকুল হ'য়ে উঠেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, কারণ বিবেকানন্দের মাঝেই যে হবে তাঁর নব-রূপান্তর।

সিমলার দত্ত পরিবারের ছেলে নরেন্দ্রনাথ, ডাক নাম বিলে। পিতামহ দুর্গাচরণ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বাবা বিশ্বনাথ ছিলেন সহরের নামজাদা এটর্নী। মা ভুবনেশ্বরী বীরেশ্বর মহাদেবের আরাধনা ক'রে কোলে পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। পিতামহের ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা, মায়ের নীরব ভক্তি-ব্যাকুলতা—এই দুই বিশেষত্বের মাঝেই লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যৎ বিবেকানন্দের আবির্ভাব-সম্ভাবনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার পথ সকলের জন্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশের তরুণদের জন্য, সর্বকালের তরুণদের জন্য একটা আদর্শ তো চাই। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, সংযমে, নিষ্ঠায়, নির্ভীকতায়, বুদ্ধি ও মেধায়—সর্বগুণের সমন্বয়ে সৃষ্ট হবে সেই আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্বপ্ন রূপ নিয়েছিল নরেন্দ্রনাথের মধ্যে।

বিরাট এক জীবন বিবেকানন্দের। সে জীবন বর্ণনা করি এমন ক্ষমতা আমার নেই। অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর প্রত্যেকটি বই অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা যা ব'লেছি, এখানেও সেই একই কথা। নিজে জানতে হবে এই অলৌকিক মহামানবের জীবনকে, পড়তে হবে এবং প'ড়ে বুঝতে হবে তাঁর প্রতিটি কথা। তাঁর প্রতিটি উপদেশ পালন করার কথা আর বললাম না, কারণ বাংলাদেশের তরুণরা যেদিন তাঁর উপদেশের অতি সামান্য একটা অংশ পালন করতে শিখবে সেদিন বাঙ্গালীর আর কোন দুঃখ থাকবে না, সেদিনই হবে বাঙ্গলাদেশের সত্যিকারের সুদিন।

আমি শুধু নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে রূপান্তরের সামান্য একটু আভাস এখানে দিচ্ছি।

নরেন্দ্রনাথের ছিল সর্বতোমুখী প্রতিভা। যেমন ছিল তাঁর জ্ঞানপিপাসা, তেমনি ছিল ঈশ্বরলাভের গভীর ব্যাকুলতা। কিন্তু দর্শনের বই প'ড়ে বা সহরের সেরা ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে মিটছিল না তাঁর অন্তরের তৃষ্ণা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বললেন "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বরকে স্বচক্ষে দেখেছেন।" পেলেন না মনের মত উত্তর। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতও বৃথা হ'ল। পরম বাস্তববাদী নরেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরকে চোখ বুঁজে মেনে নেবেন না, নেবেন যাচাই ক'রে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাঁর প্রশ্নের উত্তর? কার কাছে মিলবে সর্বপ্রাপ্তির পরমা শান্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়ে দিলেন দক্ষিণেশ্বরের পথ। এর আগে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ প্রথম দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। কিন্তু সে শুধু দেখাই। আত্মার আত্মীয়তা স্থাপনের সুযোগ এল রামচন্দ্রের ইসারায়।

বিবেকানন্দের মুখেই শোন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী ঃ

"এই মহাপুরুষের কথা আমি শুনিয়াছিলাম। একদিন তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য আমি তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথম দেখিয়া মনে হইল একজন অতি সাধারণ লোক…অতি সহজ সাধারণ ভাষায় তিনি কথা বলিতেছিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম—এও কি সম্ভব যে ইনি একজন মহান ধর্মোপদেষ্টা? ধীরে ধীরে আমি তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম এবং যে প্রশ্ন পূর্বে আরও অনেককে করিয়াছি সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? উত্তর আসিল—'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।'

"আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন?"

"হ্যাঁ, পারি।"

"কিরূপে?"

"যেহেতু তোমাকে যেমন এখানে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তাঁকেও ঠিক তেমনি দেখছি, বরঞ্চ আরও স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে দেখতে পাচ্ছি।"

এই উত্তর তৎক্ষণাৎ আমার অন্তর স্পর্শ করিল। জীবনে এই প্রথম এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম যিনি সাহসপূর্বক বলিতে পারিলেন যে, তিনি ঈশ্বরকে বস্তুতঃ দর্শন করিয়া থাকেন এবং অধিকন্তু কহিলেন যে, জড়জগৎ যেমন আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ-গোচর, ধর্মও তেমনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির ব্যাপার;—এমন কি ধর্মের অনুভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির অপেক্ষা আরও বাস্তব, আরও গভীর।"

এরপর ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু হ'ল নরেন্দ্রনাথের। তাঁর নিজের মুখেই শোন সেই অভিজ্ঞতার কথা ঃ

"দিন দিন আমি সেই মহাপুরুষের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম···যে মুহূর্তে আমি এই ব্যক্তিটির দর্শনলাভ করিলাম সেই মুহূর্তেই যেন আমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল।"

পরের কথার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিকই যে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখার পরই শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের পথ। কিন্তু জোর ক'রে কাছে তিনি টানতে চাননি নরেন্দ্রনাথকে। আকুল হ'য়েছেন, কেঁদেছেন এই তরুণের পথ চেয়ে তবু কালের বিচিত্র ব্যবস্থাকে উত্তীর্ণ হ'তে চাননি। অদৃশ্য বিধাতাই যত্ন ক'রে সকলের অলক্ষ্যে গড়ছিলেন ভবিষ্যৎ বিবেকানন্দকে।

হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হ'ল, তখন তাঁর বয়স একুশ, সবে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। মৃত্যুর আঘাত না হ'লে বুঝি জাগে না অমৃতের আকাঙ্ক্ষা! পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে পড়ল সংসারের ভার, নিদারুণ অভাব মেটাবার জন্য প্রয়োজন হ'ল অর্থোপার্জনের। কিন্তু কিছুতেই চাকরী মেলে না নরেন্দ্রনাথের। ভেবে দেখো, তখনকার দিনে নরেন্দ্রনাথের মত শিক্ষিত যুবকের চাকরী মিলল না। তাই তো ব'লেছি বিধাতার বিচিত্র বিধান। নরেন্দ্রনাথ চাকরী পেলে যে বাংলাদেশ পায়না বিবেকানন্দকে, কাছে পাননা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তম ভক্তকে।

অভাবের আঘাতে ক্রমে প্রচণ্ড নাস্তিক হ'য়ে উঠলেন নরেন্দ্রনাথ। সগর্বে ঘোষণা শুরু করলেন—"ঈশ্বর নেই।" তর্ক ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন তাঁর মত। দক্ষিণেশ্বরে ব'সে খবর পান শ্রীরামকৃষ্ণ আর বোধ হয় ধীরে ধীরে বিস্তার করেন তাঁর আকর্ষণী শক্তি।

এদিকে অভাবের ভারে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন

মনে হ'ল নরেন্দ্রনাথের—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তো মা জগদম্বা শোনেন, সুতরাং মা আর ভাইবোনদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা তিনিই তো প্রার্থনা ক'রে আদায় করতে পারেন আর সেই ব্যবস্থা হ'লে আমিও তো মন দিতে পারি ঈশ্বরের আরাধনায়। যে চিন্তা সেই কাজ। তখুনই নরেন্দ্রনাথ গিয়ে উঠলেন দক্ষিণেশ্বরে।

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে ঠাকুর বললেন "ওরে, আমি যে কত বার বলেছি, মা নরেন্দ্রের দুঃখকষ্ট দূর কর; তুই মা'কে মানিস না, সেই জন্যেই ত মা শোনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে, মা'কে প্রণাম ক'রে, তুই যা' চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন।..."

তুমি ভাবছো নরেন্দ্রনাথ মা ভবতারিণীর কাছে ভাত-কাপড়ের প্রার্থনা জানালেন আর পেয়েও গেলেন। ঠাকুরের কথা তো আর মিথ্যে হবার নয়। ঠাকুরের কথা অবশ্যই মিথ্যে হ'লনা। বার বার তিন বার মন্দিরে গেলেন নরেন্দ্রনাথ এবং প্রতিবারই মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা জানালেন "মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান, ভক্তি দাও—কৃপা কর যা'তে সর্বদা তোমার দর্শনলাভে ধন্য হ'তে পারি।"

সন্তানের মনস্কামনা পূর্ণ করলেন মা। আমরা পেলাম স্বামী বিবেকানন্দকে।

মনটি প'ড়েছে ছড়িয়ে;—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তা হ'লে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হ'লে আর খবর যাবে না। —শ্রীরামকৃষ্ণ

এতক্ষণ পর্যন্ত যা ব'লেছি তাতে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-ভক্তদের সামান্য পরিচয় পেয়েছ। সন্ন্যাসীভক্তদের মধ্যমণি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও আগের চিঠিতে কিছু ব'লেছি। রামচন্দ্র দত্ত ইত্যাদি দু'চারজন গৃহীভক্তের কথাও তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। এ ছাড়া আরও কিছু গৃহীভক্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের। তাঁদের পরিচয়ের আভাস না দিলে মর্তে মানুষ নিয়ে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা সম্পূর্ণ হবে না। তাই এই চিঠিতে প্রথমেই সেই গৃহীভক্তদের পরিচয় দিচ্ছি।

বলরাম বসু ঃ—বাগবাজারের ধনী বসুপরিবারে জন্ম হয় বলরামের। ধনীর সন্তান বলরামের মন কিন্তু ছিল সাধনভজন ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনায় নিবিষ্ট। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম তাঁর পরিচয় হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। ধীরে ধীরে পরিচয় পরিণত হয় আন্তরিক আকর্ষণে। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে ঠাকুর বলতেন "মা কালীর কেল্লা" আর বলরামের বাড়ীর নাম দিয়েছিলেন দ্বিতীয় কেল্লা। এই নামকরণ থেকেই বোঝা যাবে ঠাকুরের কত প্রিয় ছিলেন বলরাম। আজ বলরামভবন পূজার মন্দিরে পরিণত হ'য়েছে, আর্ত মানুষের জন্য সে মন্দিরের অবারিত দ্বার বহন করছে ভক্ত বলরামের পুণ্যস্মৃতি। তোমার বাড়ীর কাছেই সে মন্দির। যদি না দেখা হ'য়ে থাকে, এ চিঠি পাবার পর অবশ্যই যাবে।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঃ—"শ্রীম—" এই দু'টি অক্ষরের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই মানুষটির পরিচয়। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" পুস্তকের রচয়িতার নাম আজ আর আমাদের অজানা থাকার কথা নয়।

শ্যামবাজারে এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শান্তশিষ্ট ও ধর্মপরায়ণ মহেন্দ্রনাথ যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ক'রেছিলেন। তারপর এক শুভমুহূর্তে তাঁর দেখা হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। প্রথম পরিচয়ের পর গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'তে লাগল ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ। মুগ্ধচিত্ত মহেন্দ্রনাথ সময় পেলেই চ'লে যান দক্ষিণেশ্বরে। প্রায়ই সঙ্গে থাকে কোন আত্মীয় বা ছাত্র। এইজন্যেই ঠাকুর কৌতুকভরে বলতেন "ছেলেধরা মাষ্টার।" মহেন্দ্রনাথের আগ্রহে একাধিক নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্য হ'য়েছিলেন। আর একটি কাজ ছিল মহেন্দ্রনাথের। কাজ ছিল ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকার সময়টুকু একাগ্রমনে ঠাকুরের কথামৃত পান করা এবং বাড়ী ফিরে এসে শোনা কথাগুলি লিখে রাখা। সযত্নে তিলে তিলে সঞ্চিত এই উপকরণ না থাকলে আমরা পেতাম না অপূর্ব গ্রন্থ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ—কেশবচন্দ্রের লেখা প'ড়ে গিরিশচন্দ্র প্রথম জানতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তখন কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি ব্রাহ্মদের বুজরুকী ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি প্রতিবেশী দীননাথ বসুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার পরও "পরমহংসের" ব্যবহার ন্যাকামি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি গিরিশচন্দ্র।

মনে রেখো গিরিশচন্দ্র ছিলেন সহরের শিক্ষিত সমাজের অন্যতম ব্যক্তি। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের, অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের নাম তখন সহরের সকলের মুখে মুখে। গিরিশচন্দ্রকে আজ আমরা জানি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনক, বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে। এ হেন গিরিশচন্দ্র কি সহজে, সব ভুলে লুটিয়ে পড়তে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে ?

গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক বা অভিনয় প্রতিভা সম্বন্ধে পরে তোমাকে জানাবার ইচ্ছা রইল। কিন্তু ভুলো না যে ভক্ত গিরিশ-চন্দ্রের পরিচয়টাও তুচ্ছ করবার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা যে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই গিরিশচন্দ্রের ভক্তে রূপান্তর। গিরিশচন্দ্রের নিজের লেখাতেই পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের মূলসূত্রটি। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন "...ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, এই যে পরম আশ্রয়দাতা ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ সেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি, এ কি আপদ! কিন্তু এ সকল কার্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় ঐ সকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা; আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ!"

সাধু নাগমহাশয়ঃ—পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ শহরের নিকট দেওভোগ গ্রাম দুর্গাচরণ নাগের জন্মস্থান। শিশুর মত সরল ও পবিত্র ছিলেন এই মানুষটি তাই কালক্রমে তিনি পরিচিত হ'য়েছেন "সাধু নাগমহাশয়" নামে। নাগমহাশয় সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কথা শোনো, তাহলেই বুঝতে পারবে কি সরল, সহজ, শুভ্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি, কি অপূর্ব ছিল তাঁর বিনয়, ও ঈশ্বরভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "নাগমহাশয় ঠাকুরের এক অদ্ভুত কীর্তি। পৃথিবীর বহুস্থানে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, নানারকম লোকের সংস্পর্শে এসেছি,—কিন্তু এমন মহচ্চরিত্র ব্যক্তির সাক্ষাৎ কোথাও পাইনি।"

যৌবনে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে কিছুদিন প'ড়েছিলেন দুর্গাচরণ। তারপর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সুরু করেন। দরিদ্রের সেবাই ছিল এই চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় বাবা জোর ক'রে ছেলের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেন। কিন্তু সংসারে ম'জে যাবার মানুষ ছিলেন না দুর্গাচরণ। বরঞ্চ তিনি চাইছিলেন সংসারে থেকে, আর্তের সেবা ক'রে ঈশ্বরপূজার মজা উপভোগ করতে। ঈশ্বর তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ ক'রেছিলেন। ঠিক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে আশ্রয় পেলেন দুর্গাচরণ। ভগবান হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন ভক্তকে।

ঠাকুর ব'লেছিলেন নাগমহাশয়কে "···শুধু মনটি ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখ। জনক রাজা যেমন ক'রেছিলেন তেমনি কর। গৃহস্থের জীবন কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয়ে তোমার জাবন আদর্শ হ'য়ে থাকুক।" ঠাকুরের এই ইচ্ছা কি পূর্ণ করতে পেয়েছিলেন নাগমহাশয়? গিরিশচন্দ্রের কথা শোন তা'হলেই পাবে এ প্রশ্নের উত্তর আর গৃহস্থের জীবনের আদর্শ। গিরিশচন্দ্র বলেছেন "নরেনকে ও নাগহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে প'ড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন তত বড় হ'য়ে যায়, মায়ার দড়িতে আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হ'ল যে মায়া হতাশ হ'য়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। নাগমহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু মহামায়া যত বাঁধেন, নাগমহাশয় তত সরু হ'য়ে যান। ক্রমে এত সরু হ'লেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে গ'লে চ'লে গেলেন।"

গিরিশচন্দ্রের এই মন্তব্যের মধ্যে জীবনের দু'টি দিকের পরিচয় আছে। নরেন্দ্রনাথ হ'য়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ দেশে দেশে প্রচারিত ক'বেছিলেন। ভারতের সাধনমন্ত্র দিয়ে জয় ক'রে নিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের মানুষকে।

বিবেকানন্দের জীবন বিজয়ী বীরের জয়যাত্রার মহিমায় ভাস্বর। আর নাগমহাশয়। পূর্ববঙ্গের গণ্ডগ্রামে দরিদ্র সংসার জীবনের মধ্যে সারবস্তু লাভের সাধনা তাঁর। নিজের শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছু নিয়োজিত ক'রেছিলেন দুঃখী ও দীনজনের সেবায়। নাগমহাশয়ের জীবন বিনয়ের সর্বজয়ী শক্তির অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

কেশব সেন বল্লে, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না? তা বল্লুম যে, লোক-মান্য, বিদ্যা, এ সব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোসে, মা ততক্ষণ আসে না। লাল চুসী। খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে আসে।

তুমিও মোড়লী কোচ্চ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ আছে। আছে তো থাক্।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

(১৭)

আজ পর্যন্ত তোমার সামনে কথা দিয়ে যে ছবি আঁকবার চেষ্টা করলাম, তাতে তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বাংলাদেশের আকাশে পূর্ণতেজে দীপ্ত হ'য়েছেন নূতন যুগের সূর্য—শ্রীরামকৃষ্ণ; আর তাঁকে ঘিরে বসেছে ভক্তদের চাঁদের হাট। এইসূত্রে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্ত্রী-পুরুষ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধনের বিচার ছিলনা। সব মানুষেরই তিনি ছিলেন আপনার জন এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠতো আত্মাকে ঘিরে, হ'ত আত্মার আত্মীয়তা। সুতরাং স্ত্রী ভক্তেরও কিছু অভাব ছিলনা শ্রীরামকৃষ্ণের।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনের সাধনালব্ধ আদর্শকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন জাতির অন্তরে, সমাজের সর্বস্তরে। তাই তৎকালীন নব্যবঙ্গের সান্নিধ্যে আসার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ ক'রেছিলেন তিনি। ঠিক বলতে গেলে সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নব্যবঙ্গের নেতাদের কাছে নিজে গেছেন, আলাপ ক'রেছেন এবং তাঁদের শুনিয়েছেন তাঁর কথামৃত। তিনি বলতেন—"যেখানেই শক্তির বিকাশ সেখানেই মূর্ত হয়ে আছে ঈশ্বরের বিভূতি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নারীভক্তদের কথা বলতে গেলে আপনি এসে পড়ে মা সারদামণির কথা। মায়ের কথা তোমায় আগের একটা চিঠিতে বলবার চেষ্টা ক'রেছি। আবার বলছি, মা তো শুধু ভক্ত ছিলেন না তিনি ছিলেন ভক্তিস্বরূপিণী।

এরপর ঠাকুরের নারীভক্তদের মধ্যে আমরা পাই মনোমোহনের

মা শ্যামাসুন্দরী, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মা, মণিলাল মল্লিকের ভগ্নী, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা ও গোপালের মা প্রভৃতির নাম। এ কথা তোমায় না বললেও চলবে যে এঁদের প্রত্যেকেই মহিয়সী মহিলা ছিলেন এবং প্রত্যেকেই ঠাকুরের আদিষ্ট কাজ সারাজীবন অশেষ আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা ক'রে গেছেন। আমি বুঝতে পারছি এঁদের একজনের নাম শুনে তুমি কৌতূহলী হয়ে উঠেছো। সে নামটি হচ্ছে—গৌরী মা। হ্যাঁ, তোমার ছোটবেলায় এঁরই প্রতিষ্ঠিত "সারদেশ্বরী আশ্রমে" তোমায় একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে এঁর ছবিও তুমি দেখেছো। শ্রীরামকৃষ্ণের এই নারীভক্তদের সুন্দর সব জীবনী লেখা হ'য়েছে। সেগুলো কিনে পড়তে যেন ভুল না হয়।

শুধু ভক্তদের নিয়েই তৃপ্ত হননি শ্রীরামকৃষ্ণ। নব্যবঙ্গের নেতাদের এক এক ক'রে খুঁজে বার ক'রেছেন আর তাঁদের জীবনে রেখে এসেছেন অমৃতের স্পর্শ। এঁদের সঙ্গে আলাপের অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিলাম, এর থেকেই তুমি এই মহামানবের ফুলের মত পবিত্র, গন্ধময় অন্তরের আভাস পাবে।

প্রথমেই বলি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুরের মিলন-কাহিনী। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বাড়ীতে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাদর, শ্রদ্ধাপ্লুত অভ্যর্থনার পর শুরু হ'য়েছে আলাপ ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী দেখেছি ; এইবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) ঃ তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।
শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র!

এরপর আমরা দেখছি ভক্ত ঈশান মুখুজ্জের বাড়ী গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ

শুনেছেন কাছেই থাকেন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। আর বিলম্ব নয়, বিকালেই উপস্থিত হয়েছেন তর্কচূড়ামণির বাড়াতে। তারপর নানা শাস্ত্রীয় আলাপের শেষে, যাবার সময় হাসতে হাসতে বলছেন সেই পরমারাধ্য পুরুষ "আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা রাবণকে ব'লেছিলেন—রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারি খুশী। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।" অর্থাৎ ইঙ্গিতে সেই করুণাঘন পুরুষ তর্কচূড়ামণির মাথায় রাখলেন তাঁর আশীর্বাদের কল্যাণস্পর্শ, বলতে চাইলেন তর্কচূড়ামণির যশ ভবিষ্যতে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

আবার দেখছি ভক্ত অধরচন্দ্র সেনের বাড়ীতে প্রতিভার প্রতীক, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ ক'রছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল—সৃষ্টির বিষয়ে একটু না জানলে স্রষ্টার কথা চিন্তা করা যায় না। যেন এই ভুল ধারণা দূর করবার জন্যই ঠাকুর বললেন, "তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও, বাগানে কত আমগাছ, কত ডাল, কত আম, কত পাতা—এগুলো দিয়ে তোমার দরকার কি? আরও দেখ, সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি—এ' সব দেখেই অবাক্। কিন্তু কই বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন?"

বঙ্কিম: তাঁকে পাই কেমন ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ : ব্যাকুলভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। ব্যাকুল-ভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।"

না ডাকলেও এগিয়ে গিয়ে কিন্তু কথামৃত বিতরণ ক'রে আসতেন আমাদের করুণাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

গুরু হ'তে মানুষ পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। মহাপাতক, অনেক দিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তাঁর কৃপা হ'ল একক্ষণে পালিয়ে যায়।

হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের ভিতর যদি আলো আসে, তা হ'লে সেই হাজার বছরের অন্ধকার কি একটু একটু ক'রে যায় না একক্ষণে যায়? অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যুগসূর্য শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে যে চাঁদের হাট ব'সেছিল, তার কিছু পরিচয় তুমি পেয়েছ। সত্যিই চাঁদের হাট ব'সেছিল সেদিন। শুধু কি দক্ষিণেশ্বরে ব'সে অগণিত ভক্ত ও দর্শককে কথামৃত বিলিয়েই তৃপ্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ! তাঁকে আমরা বার বার দেখেছি ভক্তিরসের সুধাভাণ্ডটি নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে কাশীপুর পেরিয়ে, বাগবাজারের পুল পেছনে ফেলে চ'লেছেন সহর ক'লকাতায়। হাসিমুখে গাড়ীতে ব'সে আছেন লীলাময়, হঠাৎ চোখে পড়ল বাগবাজারে বলরামের বাড়ীর কাছে এক বাড়ীর সামনে রকে ব'সে আছেন গিরিশচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে হাত তু'লে প্রণাম করলেন প্রেমের ঠাকুর। প্রত্যুত্তরে গিরিশচন্দ্র যদি প্রণাম করেন তা হ'লে আবার প্রণাম জানাবেন ঠাকুর। স্বয়ং কৃপাময় যে তৃণাদপি সুনীচ, এ তিনি প্রমাণ করবেনই।

আরও প্রমাণ করবেন যে ঈশ্বরের বিভূতি দেখতে তিনি যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানেই যাবেন, বলবেন, "যদি লোকের মুক্তির জন্য আমাকে বার বার জন্মাতে হয়, তাতেও আমি রাজী। একটি মাত্র মানুষের সাহায্যের জন্য আমি এ রকম বিশ হাজার বার জন্ম নিতে প্রস্তুত। একজনকে উদ্ধার করতে পারাও কম কথা নয়।"

দক্ষিণেশ্বরে আর ক'লকাতায় যখন আনন্দের বান উথলে উঠেছে, আসর যখন জমজমাট, তখনই অলক্ষ্যে ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে আসছিল মহাপ্রয়াণের মহালগ্ন। শেষ হ'য়ে আসছিল মর্ত্যভূমিতে নরদেহে মহাশক্তির লীলাখেলা। ভক্তির প্লাবন কিন্তু বাংলাদেশের গণ্ডী পেরিয়ে, ভারতবর্ষকে আলোড়িত ক'রে ঝাঁপিয়ে

পড়তে চাইছিল বিশ্বমানবের বুকে। তাই সেদিন শেষের পাশেই চলছিল শুরুর প্রস্তুতি।

শেষের সূত্রপাতে আমরা দেখি গলায় ব্যথা হ'য়েছে ঠাকুরের। সময়টা ১৮৮৫ সালের গ্রীষ্মকাল। সবে তখন সহরে বরফের ব্যবহার আরম্ভ হ'য়েছে। ভক্তরা বরফ আনছেন আর বালকের মত আনন্দে ঠাকুর মুঠো মুঠো মুখে ফেলছেন। অনেকে বলেন এই বরফেই লুকিয়ে ছিল রোগের বীজ।

এই সময়েই পাণিহাটির মহোৎসবে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন ঠাকুর। অসুস্থ শরীরের জন্য কোন কোন ভক্ত বাধা দিচ্ছিলেন। ঠাকুর কিন্তু যাবেনই। ভক্তদের বললেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার বসে। তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, কখনো ওরূপ দেখিস্ নি—চল্ দেখে আসবি।" কালের প্রয়োজনে শুধু ইংরাজীই বলছেন না ঠাকুর—পুরাতনকে এনে মিলিয়ে দিতে চাচ্ছেন নূতনের সঙ্গে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্রেরশিখা দিয়ে দীপ্ত করতে চাইছেন 'ইয়ং বেঙ্গল' ভক্তদের অন্তরের প্রদীপ।

মহোৎসবে সারাদিন কীর্তনের মহানন্দে মেতে রইলেন ঠাকুর, ভাবসমাধির গভীর অতলে তলিয়ে গেলেন বার বার। দিনের অত্যাচারে রাত্রে জ্বর দেখা দিল, অসহ্য হ'ল গলার ব্যথার যন্ত্রণা। ভক্তেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। চিকিৎসক কথাবার্তা এবং ভাবসমাধি এই দুটি থেকে বিরত থাকবার উপদেশ দিলেন। নিষেধ জারী হবার পর ঠাকুর এক ভক্তকে কি বলছেন শোন। অনেক দূর থেকে এসেছেন ভক্তটি। তাঁকে দেখেই ঠাকুর ব'লে উঠলেন, "তা ব'লে একেবারে কথা বন্ধ ক'রে কি থাকা যায়? এই দ্যাখ দেখি—তুই কত দূর থেকে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয়?"

কথাও বন্ধ হ'ল না, রোগও বেড়ে চলল উত্তরোত্তর। ভক্তেরা তখন পরামর্শ ক'রে চিকিৎসার সুবিধার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন ক'লকাতায়। শ্যামপুকুরের এক ভাড়া বাড়ীতে চিকিৎসা করলেন সেকালের স্বনামধন্য চিকিৎসক বৈজ্ঞানিকপ্রবর মহেন্দ্রলাল সরকার। সেই বাড়িটার ভগ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে, তোমাদের স্কুলের খুব কাছেই।

চিকিৎসায় রোগের উপশম হচ্ছিল না। চিকিৎসকরা জানালেন চিকিৎসার অসাধ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন ঠাকুর। বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলাল এতদিনে রূপান্তরিত হ'য়েছিলেন এক "গম্ভীরাত্মা" ভক্তে। তিনিই ঠাকুরকে সহরের আবহাওয়ার বাইরে, প্রকৃতির শ্যামল, স্নিগ্ধ পরিবেশে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

কাশীপুরের বাগানবাটীতে গেলেন অসুস্থ ঠাকুর। আমরা দেখি এইখানে মৃত্যুর পদধ্বনিকে ব্যর্থ ক'রে বাজছে অমৃতবীণার সুর। রোগশয্যায় শুয়ে বলছেন ঠাকুর, "শরীর আর তার ব্যারাম, তারা একপাশে প'ড়ে থাকুক;—ও আমার মন, তুই ফিরেও সেদিকে তাকাস্ না, তুই পরমানন্দে ডুবে থাক্।"

সত্যিই, আনন্দ সেদিন নানা ধারায় ছুটে চ'লেছিল কাশীপুরের বাগানবাটীতে রোগশয্যায় শয়ান এই দিব্যপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে। শিষ্যবর্গকে, তাঁদের নেতা নরেন্দ্রনাথকে, ধীরে ধীরে নিজের সাধনার আলোকে উজ্জীবিত ক'রছিলেন ঠাকুর, তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করছিলেন সেই আলোকবর্তিকা বহনের মহৎ প্রয়োজনে। এই সময়কার দু'টি ঘটনা ভুলবার নয়।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী কল্পতরু হ'লেন ঠাকুর, বাগান-বাটীতে সমাগত সকলের মাথায় উজাড় ক'রে দিলেন তাঁর

আশীর্বাদ। এই দিনটিকে স্মরণ ক'রে আজও প্রতি বৎসর সমারোহের সঙ্গে "কল্পতরু উৎসব" পালিত হয়।

আর একদিন নির্জনে নরেন্দ্রনাথকে সামনে নিয়ে ব'সলেন ঠাকুর। পরক্ষণেই গভীর সমাধিতে মগ্ন হ'লেন তিনি। ক্রমশঃ এক অপূর্ব শক্তিপ্রবাহে আচ্ছন্ন হ'ল নরেন্দ্রনাথের সত্তা। জ্ঞান হবার পর নরেন্দ্রনাথ দেখলেন ঠাকুরের দু'চোখ বেয়ে নেমেছে অশ্রুধারা। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর বললেন "আজ তোকে আমার সকল শক্তি নিঃশেষে দান ক'রে ফকির হ'লাম। এই শক্তির দ্বারা তুই জগতের অনেক উপকার করবি, এবং ব্রত সাঙ্গ হ'লে পর তবে ফিরে যেতে পারবি।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রত সাঙ্গ হ'য়েছিল, তাই তিনি ফিরে গেলেন ১২৯৩ সালের (১৮৮৬ খৃঃ) শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন।

ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড়, নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হ'য়ে থেকোনা। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে বলেছিল, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, চন্দনগাছের বন, আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, রূপার খনি; আবার এগিয়ে দেখে, সোনার খনি; শেষে দেখে হীরা মানিক!

এগিয়ে পড়! আরও এগিয়ে যাও, চন্দনকাঠ পাবে, আরও এগিয়ে যাও, রূপার খনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও, সোনার খনি পাবে; আরও এগিয়ে যাও, হীরে মানিক পাবে। এগিয়ে পড়!

- শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবনকথা শেষ করবার আগে আবার আমাদের প্রথম চিঠির কথায় ফিরে যেতে হবে। আর সত্যি ঠাকুরের কথামৃত তো শেষ হয়নি, শেষ হবারও নয়। সে অমৃতের স্রোত আজও আমাদের সমাজে, সংসারে, মনে, প্রাণে প্রবহমান। ৺গয়াধামে বিস্তীর্ণ বালির তলা দিয়ে ব'য়ে চ'লেছে ফল্গুনদী। এই অমৃতের স্রোতও সেই ফল্গুনদীর মত। চোখের আড়ালে ব'য়ে চ'লেছে প্রত্যেক বাঙালীর মর্মের গোপন-গভীরে। শ্রীগৌরাঙ্গ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—এই অমৃত স্রোতেরই বিভিন্ন ধারার অপূর্ব, অলৌকিক রূপায়ন। এই বিভিন্ন স্রোতের সঙ্গমস্থল আমাদের বাংলাদেশ, আমাদের সোনার বাংলা। বাংলাদেশের ক্ষয় নেই, বাঙালীর ভয় নেই।

এই পরম আশ্বাস-বাণী শোনাতেই এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সকলকে ডেকে বলতে চেয়েছিলেন—তোমাদের ভয় নেই, তোমরা অমৃতের সন্তান। ঠাকুরের এই অভয়বাণী মুখর হ'য়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে। অমৃত স্রোতের, অনন্তপ্রবাহের সে এক নূতন রূপ। সে কথা, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কথা এরপর তোমায় শোনাবার ইচ্ছা আছে। এখন ঠাকুরের কথা কিছু ব'লে শেষ করি।

ঠাকুরের কথা তো একটিই—প্রথম কথা এবং শেষ কথা। "ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের প্রধান এবং পরম উদ্দেশ্য।" কাজে এবং কথায় এই একটি সত্যকেই তিনি আর্ত মানুষের জীবনে সঞ্চারিত করতে চে'য়েছিলেন। এই একই কথা তিনি নানা ভাবে, নানা

রূপকের সাহায্যে, গল্পের ছলে ব'লেছেন। সারা 'কথামৃতে'র মন্থনে এই একটি অমৃত-মন্ত্রই উঠবে—মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ।

সেই ঈশ্বরলাভের পথও তিনি নির্দেশ ক'রেছেন। সকলের সাধ্যায়ত্ত পথ। সহজ, সরল পথ। বার বার ব'লেছেন– ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় প'ড়ে আছে তা দেখেন না। তা হ'লে প্রশ্ন এই মন কেমন করে ঈশ্বরের দিকে যাবে? এর অসংখ্য উত্তর আছে ঠাকুরের কথামৃতে। একটা উত্তর এখানে বলছি। শিষ্য বলরামের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম আলাপ শোন:

বলরাম প্রশ্ন করলেন—মহাশয়! ভগবান কি সত্যই আছেন? ঠাকুরের সহাস্য উত্তর—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছেন।

—তাঁকে কি পাওয়া যায়?

—যায় বৈ কি। যে ব্যক্তি তাঁকে আপন হ'তেও আপনার ব'লে জানে, তার কাছে তিনি ধরা দেন। দু'একবার মাত্র ডেকে যদি তাঁর দেখা না পাও, তা থেকে মনে করা উচিত নয় যে তিনি নেই।

—এত প্রার্থনা ক'রে এবং বার বার ডেকেও কেন তবে তাঁর দেখা পাই নে?

—নিজের সন্তানের প্রতি যেমন টান, তাঁর প্রতিও তেমন টান কি তোমার মনের মধ্যে কখনও হ'য়েচে?

—না, মহাশয়! তেমন টান ত কখনও হয়নি।

—তবে আর পাওনি ব'লে কেন নালিশ করচ? আপন হ'তেও আপনার জ্ঞানে তাঁকে ডাক। আমি তোমাকে বলচি ভক্তের প্রতি তাঁর বড়ই ভালবাসা। ভক্তকে দেখা না দিয়ে তিনি

থাকতে পারেন না। মানুষ তাঁকে পুরাপুরি চাইবার আগেই তিনি নিজে এসে দেখা দেন। তাঁর চেয়ে এমন আপনার লোক, এমন দয়াল আর কে আছে?

দয়াল ঠাকুর সেই পরম দয়ালকে পাবার সহজ, সরল পথটি ব'লে দিলেন। কি নিশ্চয়তার সুর! কি জোরের সঙ্গে নিজের উপলব্ধ সত্যকে সকলের মঙ্গলের জন্য বলা! মনে রেখো সকলের মঙ্গলের জন্য মর্তধামে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বার বার ব'লেছেন—ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা। সে ভক্ত হবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের। ঈশ্বরলাভের জন্য হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে হবে না। তাঁর দিকে মন ফেরাবার জন্য সংসার ছেড়ে, গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী হবার প্রয়োজন নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে এই পরম আশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত।

ঋষি বা সন্ন্যাসী, পৃথিবীতে ক'জনই বা আছেন। সর্বস্বত্যাগ সকলের সাধ্য নয়। আমাদের আশেপাশে সকলেই সংসার নিয়ে ব্যস্ত। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এই সংসারে থেকেই চাইছে সুখ আর শান্তি। সুতরাং আমাদের মত মানুষের প্রশ্নও একটাই—এই সংসারে থেকে কেমন ক'রে পাওয়া যায় প্রকৃত সুখ? কি ক'রলে লাভ হয় পরমা শান্তি? আমার এক এক সময় মনে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন পৃথিবীতে, আমাদের মধ্যে, আমাদের মত একজন হ'য়ে, এসেছিলেন করুণাঘন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। অধরচন্দ্র সেনের সঙ্গে ঠাকুরের আলাপের মধ্যে এই সম্বন্ধে সুন্দর কয়েকটি কথা আছে। ঠাকুর অধরচন্দ্রকে বলছেন:

"তুমি ডিপুটি। এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হ'য়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দু'দিনের জন্য।

"সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ী, ক'লকাতায় গিয়ে কর্ম করে।

"কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ ক'রে নিতে হয়! স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ্গ সব দিয়ে হাওয়া করে; যাতে আগুনটা খুব হ'য়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ্। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়েছিল। তারপর তামাক খাবে।"

"আমি মনে ত্যাগ করতে বলি। সংসার ত্যাগ বলি না।

"......ঈশ্বরেতে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তারপর পেন্সান ভোগ করবে।"

সংসারে থেকে এই ঈশ্বরে মন রাখার উপায়টিও বলতে ভোলেননি ঠাকুর। এ সম্বন্ধে তাঁর অসংখ্য উপদেশ আছে। একটা এখানে বলছি। "কথামৃত" প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে (শ্রীম) ঠাকুর বলছেন ঃ

মাষ্টার (বিনীতভাবে)—সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে?

"সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে।......"

"বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ ক'চ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন প'ড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে, বলে, 'আমার রাম' 'আমার হরি'। কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।"

"কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় প'ড়ে আছে জান?—আড়ায় প'ড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।"

"ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও, তা হ'লে

আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ, এ সবে অধৈর্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে।"

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হ'লে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

"কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হ'লে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে- গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে ব'সে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।"

ভক্তি লাভ তা'হলে সংসারে থেকেও সম্ভব। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রাখেন নি ঠাকুর। নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও অন্যান্য শিষ্যদের কেমন গল্পের মধ্য দিয়ে পথটি আরও পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন শোন ঃ

"এক গ্রামে পদ্মলোচন ব'লে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে পোদো পোদো ব'লে ডাকতো। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির ছিল। ভিতরে ঠাকুর-বিগ্রহ নাই—মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থগাছ, অন্যান্য গাছপালা হ'য়েছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকে বাসা ক'রেছে।...মন্দিরে লোকজনের আর যাতায়াত নাই।

"একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলে। মন্দিরের দিক থেকে শাঁক বাজছে ভোঁ ভোঁ ক'রে। গ্রামের লোকেরা ভাবলে হয়তো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কেউ ক'রেছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে, সকলে দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করবে আর আরতি দেখবে। তাদের মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে দেখে, পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ শাঁক

বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই—মন্দির মার্জনা হয় নাই—চামচিকের বিষ্ঠা র'য়েছে।···

"যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ ক'রে শাঁক ফুঁকলে কি হবে। আগে চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মত সংসারী মানুষের দুঃখে বিগলিত হয়ে বার বার ব'লেছেন—সংসারে মন শুদ্ধ রেখে কর্ম করতে হবে। প্রতি কর্মের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হওয়া চাই—সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা। সত্য জীবনে শক্তি জোগাবে। শিব নিয়ে আসবে সর্বব্যাপী মঙ্গলের আশীর্বাদ। সুন্দরের পূজায় মন্দের মন্দিরে পড়বে পরমা শান্তির প্রসাদ। সত্য, শিব আর সুন্দরের মাঝেই তো ঈশ্বরের প্রকাশ। সেই তো প্রকৃত ঈশ্বরলাভ।

—শেষ—

কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থসম্ভার

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে। বিশ্বদেব বিশ্বাস

"দুর্গম পর্বতারোহনের কাহিনী। বাংলাসাহিত্যে এ-ধরনের গ্রন্থ এই প্রথম, সুতরাং অভিনন্দনযোগ্য। তথ্যবহুল এই গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি দামী ফটো থাকায় এর মূল্য অনেক বেড়েছে। শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু একটি চিঠিতে লেখককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই গ্রন্থের যোগ্য সমাদর হোক এই কামনা করি।"—যুগান্তর।

দাম : ২·৫০ ॥

ডাকটিকিটের জন্মকথা। শচীবিলাস রায় চৌধুরী

বাংলায় এ ধরনের বই আর নেই। শুধু ডাকটিকিট-সংগ্রহকারীরাই নয়, সাধারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকও এই গ্রন্থে অজস্র তথ্য ও কাহিনীর সন্ধান পাবেন। মূল্যবান প্রামাণ্য বই। তিনশতাধিক দেশবিদেশের স্ট্যাম্প ও অন্যান্য চিত্র।

দাম : ৬·০০ ॥

স্কুলের মেয়েরা। পরিমল গোস্বামী

সচিত্র সুন্দর কাহিনী। উপহারের বিশেষ উপযোগী।

দাম : ২·০০ ॥

ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস। প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঙ্গে 'পিঁপড়ে পুরান'। দুটি আশ্চর্য উপন্যাস একত্রে।

দাম : ২·৫০ ॥

সন্দীপন পাঠশালা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহৎ উপন্যাসের সচিত্র কিশোর সংস্করণ। দাম : ১·৫০ ॥

বাঘের চোখ। লীলা মজুমদার

নতুন লেখা। সচিত্র ও সুন্দর বই। দাম : ২·৫০ ॥

বাছাইকরা অনুবাদ-সাহিত্য

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকজন বিদেশী লেখকের বারোখানি বিভিন্ন বিষয়ক রচনা-সঞ্চয়ন সকলকার সাধ্যায়ত্ত মূল্যে পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। গ্রন্থগুলি কৃতী লেখকবৃন্দ কর্তৃক নিপুণতার সহিত অনূদিত ও সম্পাদিত এবং সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। ব্যক্তি ’ত ও সাধারণ পাঠাগার এবং স্কুল-কলেজ লাইব্রেরীর পক্ষে অপরিহার্য। তিনখানি একত্রে বোর্ড বাঁধাই। সুচারু রঙীন প্রচ্ছদ। উপহারের উপযোগী শোভন সংস্করণ।

গ ল্প স ঞ্চ য় ন

নির্বাচিত গল্প	নির্বাচিত গল্প	নির্বাচিত গল্প
ও’ হেনরি	এডগার অ্যালেন পো	ন্যাথানিয়েল হথর্ন

॥ বিশ্বসাহিত্যের একুশটি শ্রেষ্ঠ গল্প একত্রে। ডবল ক্রাউন ৩৯০ পৃষ্ঠায়
এই খণ্ডের মূল্য ২'০০ মাত্র ॥

কি শো র পা ঠ্য স ঞ্চ য় ন

টম সইয়ার (কাহিনী)
মার্ক টোয়েন

এব লিঙ্কন (জীবনী)
ষ্টার্লিং নর্থ

কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা (ভ্রমণ)
আর্মষ্ট্রং স্পেরি

॥ ছোট বড় সবার পক্ষেই সুপাঠ্য সঞ্চয়ন। ডবল ক্রাউন ৪৫৮ পৃষ্ঠায়
এই খণ্ডের মূল্য ২'০০ মাত্র ॥